কুয়াশা সিরিজ—৫১



প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্ লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

মে
১৯৬১

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯



উপহার

শ্রীমুরারি মোহন বাঁট

প্রণীত

কয়েকখানি বই

কাজল গড়ের কাহিনী

নীল চোখের সংকেত

গিরিগুহার রহস্য

প্রাণ নিয়ে খেলা

অদৃশ্য বিচারক

নিয়তির দূত

গিরিগুহার রহস্য

॥ ভূমিকা ॥

মিত্র-মহল।

বাড়ির সদর ফটকের দুপাশে দুটো শ্বেত-পাথরের ফলক। ডানদিকের ফলকে বাড়ির নাম লেখা—'মিত্র মহল', আর বাঁ দিকের ফলকে বাড়ির নম্বর—১৫৪/১/সি।

ব্যারিস্টার রাজেন্দ্রপ্রসাদ মিত্রের বাড়ি। মহলের মতই বিরাট বাড়ি। ফুলগাছে ভরা বিস্তীর্ণ কম্পাউণ্ডওলা তিনতলা প্রাসাদ। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় সত্তর। কিন্তু বয়সের তুলনায় তাঁকে তেমন বৃদ্ধ দেখায় না। এককালে অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন বোঝা যায়। অনেকদিন পূর্বেই তিনি আইন ব্যবসায়ের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে অবসর-জীবন যাপন করছেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় রাজেনবাবু তাঁর সদর-মহলের বৈঠকখানা ঘরে ইজিচেয়ারে বসে পাইপ টানছিলেন, আর তাঁর অনতিদূরে মেঝের ওপর ফরাশ বিছিয়ে ক্যারম পিঠছিল তাঁরই আঠারো বছরের কলেজ-স্টুডেন্ট নাতি দীপক এবং তার তিন সহপাঠী—সঞ্জয়, শৈলেন আর অমিত। খেলার সঙ্গে সঙ্গে ওদের মধ্যে নানা গল্প-গুজবও চলছিল। হঠাৎ কেমনভাবে যেন ওরা ভূতের প্রসঙ্গে এসে গেল।

পাইপ টানতে টানতে রাজেনবাবু সকৌতুকে শুনছিলেন ওদের ভৌতিক আলোচনা। দীপকের তিন সহপাঠীকেই তিনি বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর অবিশ্বাসী লক্ষ্য করলেন। সম্পূর্ণ না হলেও দীপক কিছুটা ভূত-প্রেত বিশ্বাস করতো। কিন্তু তিন ঘোর নাস্তিকের সঙ্গে এক আস্তিক তর্কযুদ্ধে নাস্তানাবুদ হয়ে শেষ পর্যন্ত ডাক ছাড়লো, —দাদু!

রাজেনবাবু ফিরে তাকালেন।

দীপক বললো, সেই গল্পটা তুমি এদের একবার শুনিয়ে দাও দাদু। সেই হিমালয় পর্বতের গল্পটা। তুমি শিকারে গিয়েছিলে··· গল্পটা শুনলে এরা ভূত-প্রেতকে হয়তো আর এতটা অবিশ্বাস করবে না।

তিন সহপাঠী প্রথমে তাকালো দীপকের দিকে, তারপর তাকালো রাজেনবাবুর দিকে। ওদের উৎসুক নেত্রের দিকে চেয়ে রাজেনবাবু শুধু একটু হাসলেন। তিনজনে প্রায় সমস্বরেই বলে উঠলো, গল্পটা বলুন দাদু; ভূতের গল্প বুঝি? আপনার জীবনে ঘটেছিল?

পাইপে খুব জোর একটা টান দিয়ে রাজেনবাবু বললেন, হ্যাঁ, আমার জীবনেই ঘটেছিল। তবে গল্পটা ভূতের গল্প কি না, বা ঘটনার মধ্যে কোন ভৌতিক রহস্য লুকিয়ে আছে কি না, সে বিবেচনার ভার তোমাদের ওপর। দীপক গল্পটাকে ভৌতিক ঘটনা বলেই মেনে নিয়েছে। এবং গল্পটা শোনার পর থেকেই ও ভূত-প্রেত বিশ্বাস করে, —আগে করতো না।

—আপনার নিজের কি অভিমত দাদু?

—আমার অভিমত প্রকাশ করবো না। গল্পটা শুনে তোমরা নিজের নিজের বিচার শক্তি দ্বারা ঘটনার মীমাংসা করে নেবে —কেমন ?

॥ এক ॥

আমার বয়স তখন ত্রিশ-বত্রিশ হবে। প্র্যাকটিস শুরু করেছি সবেমাত্র। সে সময় শিকারের দিকে আমার ঝোঁক ছিল খুব বেশী। সুযোগ পেলেই শিকারে বেরুতাম। সেবার আমরা তিন বন্ধুতে হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে শিকারে গিয়েছিলাম। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বেশ খানিকটা ওপরে আমাদের তাঁবু পড়েছিল। সঙ্গে ছিল তিনজন কুলি। তারা জাতিতে পাহাড়ী। হিমাচল প্রদেশ থেকে ওদের সংগ্রহ করে নিয়ে আমরা অরণ্যপথে রওনা হয়েছিলাম।

আমাদের তাঁবু পড়েছিল অরণ্যের এক প্রান্তভাগে। তাঁবুর পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল সংকীর্ণ একটা পাহাড়ী নদী। নদীর ওপারে যতদূর দৃষ্টি যায় হালকা বন। সে-বনে তেমন কোন হিংস্র জানোয়ার বাস করে বলে মনে হল না।

যেখানে আমাদের তাঁবু পড়েছিল, সেখানেই তিন-চার দিন কাটিয়ে আমরা ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে আসবো, এই ছিল আমাদের মনের ইচ্ছা। কিন্তু জানো তো, মানুষ ভাবে এক রকম, ভাগ্যে ঘটে অন্যরকম। আমাদেরও হল তাই।

আমাদের তাঁবু পড়েছিল বেলা দুটো নাগাদ। সেই কোন্ সকালে আটটার সময় এক কাপ চা, একখানা টোস্ট, আর দুটো ডিমের ওমলেট খেয়ে অরণ্যে প্রবেশ করেছি, এ পর্যন্ত পেটে আর দানা-পানি পড়েনি। প্রত্যেকেরই খিদে পেয়েছে অতিরিক্ত। বলতে লজ্জা করে, আমি আবার একটু পেটুক মানুষ—আমার খিদের ছটফটানি সবচেয়ে বেশী। তাঁবু খাটানো সম্পূর্ণ হবার আগেই আমি স্টোভ জ্বেলে বসলাম। অসীম আর উৎপল ওরা দুজনে কুলিদের নিয়ে তাঁবু খাটানোর অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করতে লাগলো। এখানে অসীম-উৎপলের যৎসামান্য পরিচয় দেওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে বোধ করি না। অসীম হল, অসীমরঞ্জন চৌধুরী, ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা শহরের অধিবাসী; আর উৎপল হল, উৎপল সেনগুপ্ত, মধ্যপ্রদেশের রায়পুর শহরের বাসিন্দা। আর আমি? কোলকাতার একজন অখ্যাত আইনজ্ঞ—দীপক এবং তোমাদের দাদু। বন্ধু দুজনের কেন পরিচয় দিলাম বুঝলে তো?

শৈলেন বললো, সত্যি দাদু, আপনার বন্ধু সংগ্রহের মধ্যে নতুনত্ব আছে!

অমিত বললো, আমার তো মনে হয় দাদু, কোলকাতা বা কাছাকাছির মধ্যে আপনার কোন শিকারী-বন্ধু হয়তো নেই, সেই-জন্যেই আপনার এইরকম বিচিত্র বন্ধু-সংগ্রহ।

রাজেনবাবু বললেন, না, তা নয়। বৈচিত্র্য বজায় রাখবার জন্যই এই বিচিত্র সংগ্রহ! যাই হোক, তার পর শোন। আমাদের সকলকার খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে চারটে বাজলো। শরীরও

বড় ক্লান্ত হয়ে গেছে। সেদিন আর শিকারে বেরুবার আয়োজন না করে তাঁবুর বাইরে শতরঞ্জি বিছিয়ে দাবার ছক নিয়ে বসলাম, আর কুলিদের একটা ভেলা তৈবি করতে হুকুম দিলাম। নদীর ধারে বাস—নদীতে বেড়াবার শখ বা প্রয়োজন হতে পারে।

একজন কুলি জানালো যে, আজ শিকারে না বেরুলেও ভাগ্য প্রসন্ন হলে তাঁবুতে বসেই ভাল শিকার মিলে যেতে পারে। কারণ এই নদীর কাছাকাছি জায়গায় যে সমস্ত জন্তু-জানোয়াবেরা বাস করে, তারা এই নদীতেই জলপান করতে আসে।

আমি বললাম, শিকাব যদি হাতের কাছে এসে ধরা দেয়, সে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু আমরা আজ আর কোনরকম শিকারের আয়োজন করবো না। তোমরা তিনজন রয়েছো, আগুন জ্বেলে পালাক্রমে রাতটা পাহারা দেবে। সঙ্গে বন্দুক রাখবে, শিকার যদি নাগালের মধ্যে আসে গুলি চালাবে—ব্যস্ এই পর্যন্ত! বা যদি সুযোগ ও সময় পাও, আমাদেরও ডেকে তুলতে পারো। কাল থেকে শিকারের তোড়জোড় করা যাবে কেমন?

ঐদিন রাত্রেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। রাত তখন প্রায় দশটা হবে। আমরা সকলে শুয়ে পড়েছি অনেকক্ষণ আগেই। অসীম আর উৎপলের বেশ জোর নাক ডাকছে। কিন্তু নানা উদ্ভট চিন্তায় আমার চোখে তখনো ঘুম আসেনি। তুজন কুলিও এক-পাশে পড়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। অপর কুলিটি তাঁবুর দরজার বাইরে আগুন জ্বেলে বসে আছে পাহারায়। একটা বন্দুক পাশে

রেখেছে। ওর ডিউটি বারোটা পর্যন্ত। বারোটা থেকে আড়াইটে পর্যন্ত আরেক জনের—বাকী ' জনের আড়াইটে থেকে পাঁচটা।

শুয়ে শুয়ে কি ভাবছিলাম, আজ আর তা মনে নেই আমার। হয়তো পরদিন কিভাবে শিকারে বেরুনো যাবে, তারই প্ল্যান আঁটছিলাম মনে মনে। ভাবতে ভাবতে বোধ হয় একটু তন্দ্রার আমেজ এসেছিল, হঠাৎ একটা কান্নার শব্দে তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল। বেশ খানিকক্ষণ কান খাড়া করে রইলাম। শিশুকণ্ঠের কান্না। কোন শিশু যেন ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে। বুঝলাম নদীর ওপার থেকে শব্দটা আসছে।

আর শুয়ে থাকতে পারলাম না—উঠে পড়লাম। যে কুলিটা বাইরে পাহারা দিচ্ছিল তার নাম সোনা। সোনার পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছো?

সোনা বললো, পাচ্ছি কর্তা। ও-কান্নার শব্দ খুব খারাপ।

—কিরকম?

—আজ্ঞে ও কান্না মানুষের নয়—ভূত-প্রেতের কান্না বোধ হয়!

আমার কৌতূহল ক্রমশঃই বাড়তে লাগলো। উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম, ভূত-প্রেতের কান্না তা বুঝলে কেমন করে?

—আজ্ঞে এর আগেও এ কান্না আমি শুনেছি কর্তা। তুবার শুনেছি। আমাদের পল্লীর কাছাকাছি জঙ্গল থেকে এই রকম কান্নার শব্দ ভেসে এসেছিল। বাচ্চা ছেলে কাঁদছে মনে করে প্রথম দিন আমাদের পল্লীর তুজন জোয়ান লোক জঙ্গলের দিকে গিয়ে আর ফিরে আসেনি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, একই সঙ্গে দুজন গিয়েছিল ?

—হ্যাঁ কর্তা। তারা দুজন জোট বেঁধে গিয়েছিল।

—রাত তখন কত ?

—মাঝ রাত। তারা ভেবেছিল বনের মধ্যে কোন বাচ্চা ছেলে কাঁদছে। যারা যারা শুনেছিল, তারা প্রত্যেকেই ঐ কথা ভেবেছিল। ব্যাপার কি দেখবার জন্যে দুজনে দুগাছা লাঠি আর একটা লণ্ঠন নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা কেউ আর ফিরে আসেনি। পরের দিন সকালে পল্লীর বহু লোক তাদের খোঁজে বেরিয়েছিল! গভীর বনের মধ্যে লাঠি দুগাছা আর লণ্ঠনটা পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু লোক দুটির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

জিজ্ঞেস করলাম, এ কত দিনের কথা ?

—ঠিক মনে নেই কর্তা, বছর পাঁচ-ছয় হবে বোধ হয়। এরপর আরও একদিন ঐরকম কান্নার শব্দ পেয়ে এক সঙ্গে চারজন লোক গিয়েছিল। তিনটি মশাল আর চারজনে চারটে বল্লম নিয়েছিল সঙ্গে। কিন্তু তারাও আজ পর্যন্ত কেউ ফিরে আসেনি।

শুনে অনেকক্ষণ আমি গুম হয়ে রইলাম। একটানা কান্নার শব্দ কানে অসতে লাগলো। হঠাৎ কি খেয়াল হল, সোনার পাশ থেকে বন্দুকটা তুলে নিয়ে পর পর গুলি ফায়ার করলাম নদীর ওপার লক্ষ্য করে।

বন্দুকের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো। তারপর সেই প্রতিধ্বনি বাতাসের বুকে কম্পন তুলে দূর হতে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল।

প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতেই আমি আবার উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম… কিন্তু কান্নার শব্দ আর শুনতে পেলাম না। সোনার কানও সজাগ ছিল। সে বললো, কান্না থেমে গেছে কর্তা।

আমি শুধু চিন্তিত কণ্ঠে বললাম, হুঁ!

এদিকে বন্দুকের শব্দে প্রত্যেকেই জেগে উঠেছে। অসীম আর উৎপল ওরা হুড়মুড় করে তাঁবুর বাইরে এসে হাজির হল। ভেবেছে নিশ্চয় জাঁদরেল গোছের কিছু একটা শিকার করেছি।

বাইরে এসেই ওরা জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার রাজু?

আমি বললাম, শিশুকণ্ঠের একটা আশ্চর্য কান্না শুনতে পেলাম ভাই! দিনের বেলায় নদীর ওপারটা তো আমরা খুব ভালভাবেই লক্ষ্য করেছিলাম; যতদূর দৃষ্টি গেছে, শুধু গাছপালাই নজরে পড়েছে। অথচ এইমাত্র নদীর ঠিক ওপারেই কোন বাচ্চা ছেলে কাঁদছিল বলে মনে হল। সোনার মুখে যা শুনছি, তাতে মনে হচ্ছে এই কান্নার পেছনে কোন গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে।

অতঃপর সোনার কাছে যা শুনেছিলাম ওদের দুজনকে তা বললাম। অপর কুলি দুজনও শুনছিল আমাদের কথাবার্তা। শুনে তারা বললো যে, সোনা যা বলেছে তা মিথ্যা নয়। স্থানীয় পাহাড়ী অধিবাসীরা প্রত্যেকেই ঐ কান্নার শব্দকে রীতিমত ভয় করে চলে।

কথায় কথায় ওদের মধ্যে একজন আরও একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করলো। কিছুদিন আগে—রাত তখন দশটা সাড়ে দশটা হবে বোধ হয়—সেই সময় হঠাৎ ওদের পল্লীর উত্তরদিকের অরণ্য থেকে বাঁশির সুর ভেসে আসে। অতি অপূর্ব সে সুর। শুনে পল্লী-

বাসীরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারা যতটা মুগ্ধ হয়েছিল, ঠিক ততটাই অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। এত রাতে ঐ গভীর বনের মধ্যে কে বাঁশি বাজাচ্ছে? সেই অজানা বংশীবাদককে দেখবার জন্যে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করলো—কিন্তু অত রাতে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারে ভরা অরণ্যের মধ্যে কে আর যেতে চায়? তবুও শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, মশাল, লাঠি, সড়কি ইত্যাদি নিয়ে তিনজন সাহসী যুবক অজানা বংশীবাদকের খোঁজে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। তারা গিয়েছিল, কিন্তু কেউ ফিরে আর আসেনি!

সকলেই শুনলো। কিন্তু এই বাঁশির ব্যাপার চাপা পড়ে গিয়ে কান্নার আলোচনায় আসর ক্রমশঃ গরম হয়ে উঠলো। যার যেরকম পুঁজিতে আছে, সে সেইরকম সম্ভব-অসম্ভব নানা কথায় নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলো। গুলজার বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় সোনা বলে উঠলো, চুপ করুন কর্তারা, আবার কান্নার শব্দ আসছে!

মুহূর্তের মধ্যে সকলেই যেন বোবা হয়ে গেল! ভীষণ নিস্তব্ধতা নেমে এলো। হ্যাঁ, সুস্পষ্ট কান্নার শব্দটা শোনা যাচ্ছে! পাষাণ মূর্তির মত বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকেই শুনতে লাগলো অদৃশ্য শিশুকণ্ঠের কাতরানি!

প্রথম কথা বললো উৎপল, সত্যি, বড় অদ্ভুত তো! এমন জনমানবশূন্য বনে শিশুর কান্না অস্বাভাবিক! রহস্য নিশ্চয় আছে!

আমি শক্ত হয়ে বলে উঠলাম হঠাৎ, রহস্যটা যে কি, তা আমি জানতে চাই উৎপল! আমি এখুনিই নদীর ওপারে রওনা হবো।

জামা-প্যাণ্ট পরে আসি। আমার সঙ্গে যদি কারুর যাবার ইচ্ছা থাকে যেতে পারো।

কথাটা শেষ করেই উঠে দাঁড়ালাম।

সকলে হাঁহাঁ করে আমার গতি রোধ করলো। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, তোদের যদি সাহসে না কুলোয় তোরা যাস নে, কিন্তু আমাকে বাধা দিচ্ছিস কেন? আমাকে বাধা দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। প্রাণের মায়ায় চুপচাপ তাঁবুর মধ্যে বসে থাকবার জন্যে আমি আসিনি। তাছাড়া শুধুমাত্র শিকারের উদ্দেশ্যেও আমার এখানে আসা নয়। হিমালয়ের অরণ্যে এসেছি—যতটুকু পারি হিমালয়কে চিনে যাব, হিমালয়ের অরণ্যকে জেনে যাব। কেন মিছিমিছি তোরা আমাকে বাধা দিচ্ছিস? তোদের এটা উচিত হচ্ছে না!

তবু ওরা নাছোড়বান্দা। অসীম বললো, কোন লোকের সদিচ্ছাকে বাধা দেওয়া উচিত নয় স্বীকার করি। কিন্তু তোর এই যে ইচ্ছা, এটা মোটেই সদিচ্ছা নয়—এটা হল স্রেফ গোঁয়ারতুমি! অথবা মরণের ইচ্ছাও বলতে পারিস। সুতরাং চোখের সামনে একটা মানুষ মরবে, এ আমরা কিছুতেই হতে দেব না!

গলার সুর নরম করে বললাম, মিথ্যে ভয় পাচ্ছিস তোরা। সঙ্গে বন্দুক থাকতে ভয়টা কিসের? কোন বিপদের মুখে গিয়ে পড়লেও আত্মরক্ষা করতে পারবো, এটুকু মনের জোর আমার আছে।

অসীম বললো, ভূতের কাছে তুই বন্দুক নিয়ে কি করবি? এ যে ভৌতিক কাণ্ড তাতে কোনই সন্দেহ নেই!

ওকথায় কান না দিয়ে আমি বললাম, বেশ তো আমাকে একা যদি যেতে দিতে না চাস, তাহলে দলবল নিয়ে সকলে রওনা হই

চল্। যে ভেলাটা তৈরি করা হয়েছে, তাতে ছজন লোকের জায়গা হবে খুব।

আমার এ প্রস্তাবে অসীম বা উৎপল কেউ রাজী হল না। ওদের মনের ইচ্ছা এই: আমাকেও যেতে দেবে না—নিজেরাও কেউ ভয়ে যাবে না। বুঝলাম পাহাড়ীদের মত ওদের ঘাড়েও ভূত-প্রেত চেপেছে! ভূত-প্রেতকে যারা বিশ্বাস করে, তাদের কাছে ভূত-প্রেতের চেয়ে বড় ভয় বোধ হয় আর কিছু নেই!

যাই হোক আমি আর বেশী বাড়াবাড়ি না করে তাঁবুর ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। অসীম আর উৎপল বাইরেই থেকে গেল—বোধ হয় আরও কিছুক্ষণ গুলজার করবার ইচ্ছা।

পরদিন খুব সকালেই ঘুম ভাঙলো আমার। ঘুম থেকে উঠেই গত রাত্রের ঘটনাটা অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবলাম। অনেকটা দুঃস্বপ্নের মত মনে হলো। তারপর ওরা সকলে উঠলে প্রাতঃরাশ সেরে নিয়ে জঙ্গল পরিদর্শনে বেরুলাম।

ভাগ্যটা নিতান্ত ভালই ছিল বলতে হবে। খানিকটা গিয়ে নলখাগড়া গাছে ঘেরা ছোট্ট একটা জলা মতন দেখতে পেলাম। সেই জলা থেকে শিকার করলাম চারটে বালিহাঁস। বেশ হৃষ্টপুষ্ট হাঁসগুলো। মধ্যাহ্ন ভোজনটা সুন্দরভাবে সমাধা করা যাবে ভেবে খুশী হয়ে উঠলাম।

ঐদিনই বিকেলের দিকে বিরাট একটা অজগর আর একটা বুনো মোষ শিকার করেছিলাম। মোষটাকে মারতে রীতিমত কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল আমাদের, এবং উৎপলের জীবন নিয়ে প্রায় টানাটানি পড়েছিল। সেসব গল্প তোমাদের বলব না, কারণ শিকার-কাহিনী

বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। যাই হোক সন্ধ্যার খানিকটা আগেই আমরা তাঁবুতে ফিরে এলাম। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যখন শুলাম, রাত তখন নটা। পরদিন বাঘ-শিকারের আয়োজন করা হবে স্থির হল।

সারাটা দিন বনে বনে ঘুরে এবং শিকারের উত্তেজনার মধ্যে কাটিয়ে সবার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সকলে ঘুমিয়ে পড়লো—শুধু আমার চোখে ঘুম নেই। আজও সেই রহস্যময় কান্নার শব্দ হয়তো শুনতে পাব—এই আশায় জেগে রইলাম।

॥ দুই ॥

আমার রিস্টওয়াচে রাত দশটা বেজে গেল।

গতকাল এমন সময় কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। ক্রমে সাড়ে দশটা বেজে গেল। আমি বেশ একটু হতাশ হয়ে পড়লাম। আমার বাসনা বুঝি আর পূরণ হয় না। সারাদিন চিন্তা করে আমি মনে মনে স্থির করে রেখেছিলাম, আজও যদি কান্নার শব্দ শুনতে পাই, তাহলে সবার অজ্ঞাতে আমি বেরিয়ে পড়বো ঐ কান্নার রহস্য উদ্ধার করবার জন্যে। রহস্যটা উদ্ধার না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই—স্বস্তি নেই!

এগারোটা বাজলো। এখনো আমি আশা ছাড়তে পারিনি—বিনিদ্র চোখে চেয়ে আছি।



কাপালিক আবার ত্রিশূল নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, এবং [illegible]র দিকে [illegible]

এমন সময় সোনা তাঁবুর মধ্যে এলো। এসে আমার শিয়রের কাছে রাখা আমার রিস্টওয়াচটা একবার দেখে নিয়ে আবার বাইরে চলে গেল। বারোটা পর্যন্ত ওকে পাহারা দিতে হবে—তারপর অন্যজনের পালা।

আরও কিছুসময় পর হঠাৎ তড়িতাহতের মত আমি কেঁপে উঠলাম। সেই কান্না! কোন ক্ষুদ্র শিশু যেন নদীর ওপারে ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে! সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো আমার। আস্তে আস্তে শয্যার উপর উঠে বসলাম। মুহূর্তকয়েক মনোযোগ দিয়ে শুনলাম কান্নার শব্দটা। তারপর পরনের লুঙ্গি খুলে প্যাণ্ট, গেঞ্জি আর শার্টটা পরে নিলাম। তাঁবুর দরজা দিয়ে একবার উঁকি দিয়ে দেখলাম, অগ্নিকুণ্ডের পাশে স্থির হয়ে বসে রয়েছে সোনা। বন্দুকটা সে শক্ত করে চেপে ধরে আছে আজ।

তারপর আবার তাঁবুর অভ্যন্তরে তাকালাম। সকলেই অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সুবর্ণ সুযোগ! তাঁবুর পেছনদিকের একটা দড়ি কেটে অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারবো।

তাঁবুর মধ্যে মিটিমিটি লণ্ঠনের আলো জ্বলছিল। কাগজ আর পেন নিয়ে সেই আলোতে একখানা চিঠি লিখলাম। চিঠিখানা এইরকম:

ভাই অসীম, ভাই উৎপল,

আজও হয়তো শিশুকণ্ঠের কান্না শুনতে পাব, এই আশায় আমি জেগে ছিলাম। তোরা তো জানিস, রহস্যকে আমি পছন্দ করি, রহস্যের কথা ভাবতে আমি ভালবাসি; এবং সেই রহস্যের সমাধান করতে পারলে আরও বেশী তৃপ্ত হই। কাজেই তোরা আমাকে বাধা দিলেও আমার রহস্যপ্রিয় মন সে বাধা মানবে কেন? আমার

২

মনের দুর্নিবার ইচ্ছা, আমি ঐ কান্নার রহস্য আবিষ্কার করবোই! তাই আজ জেগে ছিলাম। এখন এগারোটা বেজে আটাশ মিনিট। এইমাত্র শুনতে পেলাম কান্নার শব্দ। এখনো স্পষ্ট কানে আসছে। তাই আমি রওনা হচ্ছি। চিঠিখানা লিখে রেখে গেলাম। যদি আমি আজ রাত্রের মধ্যে না ফিরি, তাহলে তোরা অনুমান করে নিস যে আমি বিপদে পড়েছি। ভেলাটা নিয়ে যাচ্ছি, ওপারে বেঁধে রাখবো। ইতি—রাজু।

চিঠিখানা লণ্ঠনের গোড়ায় ছোট একটা পাথরের টুকরো চাপা দিয়ে রেখে দিলাম—যাতে সেটা সহজেই নজরে পড়ে।

বারোটা পর্যন্ত সোনার ডিউটি। সে যখন তাঁবুর মধ্যে আসবে, দেখবে আমি নেই। তারপর কি হবে বুঝতেই পারা যাচ্ছে। সোনার ডাকাডাকিতে প্রত্যেকেই জেগে উঠবে। অসীম আর উৎপল ওরা দেখবে আমার চিঠি। কিন্তু চিঠিখানা পড়ে তখুনি ওরা দলবল নিয়ে আমার অনুসন্ধানে বেরুবে না সকাল পর্যন্ত আমার আগমনের প্রতীক্ষা করবে, সেটা অনুমান করতে পারলাম না।

যাই হোক চিঠিখানা লিখে রেখে জুতোটা পরে নিলাম। একটা রিভলভার এনেছিলাম, সেটা কোমরে আঁটলাম। তারপর টর্চ আর বন্দুক নিয়ে তাঁবুর পেছনদিকের একটা দড়ি কেটে বেরিয়ে পড়লাম অন্ধকারের রাজ্যে। পকেটে একটা বড় চাকু-ছুরিও আছে— চাকুটা আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী।

তাঁবু থেকে নদী মাত্র কয়েক গজের ব্যবধান। নদীর কূলে আমাদের ভেলাটা ভাসছিল। ছোট একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল সেটা। ভেলায় উঠে দড়িটা কেটে দিলাম।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ওপারে পৌঁছে গেলাম। সংকীর্ণ নদী। নদীর ওপারে পৌঁছাতে কান্নার শব্দটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠলো। খুব কাছেই যেন কোন বাচ্চা ছেলে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদছে। ভেলাটা তীরে বেঁধে রেখে কান্নার শব্দ অনুসরণ করে নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম।

এদিককার বনভূমি বেশ পাতলা। এখানে-ওখানে কয়েকটা লম্বা লম্বা গাছ, আর লতাগুল্মের ঝোপ-ঝাড়। লতাগুল্মের আধিক্য থাকলেও পথ চলতে বিশেষ কষ্ট হয় না। জঙ্গলটা দেখে মনে হল, এদিকে শিকারে এলে হরিণ পাওয়া যেতে পারে। কতদিন যে হরিণের মাংস খাইনি, তা মনে পড়ে না।

কান্নার শব্দ ক্রমশঃই নিকটবর্তী হচ্ছে। পনের-কুড়ি হাতের মধ্যেই কেউ কাঁদছে বলে মনে হল। এবার টর্চ জ্বাললাম। টর্চের আলোয় সামনে বড় একটা আগাছার ঝোপ দেখতে পেলাম। ঐ ঝোপের আড়াল থেকেই কান্নার শব্দটা আসছে মনে হয়।

টর্চ জ্বেলেই অগ্রসর হতে লাগলাম। যতই অগ্রসর হতে থাকি, ততই আমার ধারণা দৃঢ় হতে থাকে যে, ঐ ঝোপের মধ্যেই কোন বাচ্চা ছেলে পড়ে পড়ে কাঁদছে। আমার যতটা ধারণা, তাতে মনে হয় লোকালয় এখান থেকে অনেক দূরে। কাছাকাছি কোন লোকালয় আছে বলে আমার মনে হয় না। থাকলেও নিতান্ত কাছে যে নেই, অরণ্যের চেহারা দেখেই তা অনুমান করা চলে। তাই আমার বিস্ময়-সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। লোকালয় থেকে এতদূরে এই অরণ্যের মধ্যে শিশুর আবির্ভাব কেমন করে সম্ভব? এবং গতকাল থেকে সে এই হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের আবাসভূমির মধ্যে বেঁচে রয়েছেই বা

কিভাবে! তবে কি···কুলিরা যা বলছিল···কোন ভৌতিক ব্যাপার এটা? ঝোপটার একেবারে কাছে পৌঁছাতেই কান্নার শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

এই পর্যন্ত বলে রাজেনবাবু থামলেন।

চুপ করলেন কেন দাহু?—শৈলেন বলে উঠলো।

সঞ্জয় শুধালো, ওটাই কি ভূতের কান্না দাহু?

অমিত সঞ্জয়কে ধমকালো, আঃ! তুই থাম দিকি···ফ্যাচফ্যাচ করলে গল্প বলা যায় কখনো? আপনি যেমন বলছিলেন বলে যান দাহু; কে ভূত, কে পেত্নী এখন কোন কথা বলবেন না—গল্পের গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে!

রাজেনবাবু বললেন, ঠিক বলেছো। গল্পের শুরুতেই যদি গল্পের আসল রহস্য ফাঁস করে দেওয়া যায়, তাহলে গল্পের মাধুর্যই নষ্ট হয়ে যায়! সে-গল্প বলেও সুখ পাওয়া যায় না, যে শোনে সে-ও শুনে তৃপ্তি পায় না। তাছাড়া আমি তো প্রথমেই তোমাদের বলেছি যে, আমি নিজের কোন অভিমত ব্যক্ত করবো না—তোমরাই এ গল্পের ভাবার্থ উদ্ধার করে নেবে।

সঞ্জয় বললো, বেশ বলুন?

—একটু ধৈর্য ধরো···পাইপটা নিভে গেছে···পাইপে তামাক না থাকলে আমার মেজাজ বিগড়ে যায়!

তারপর তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন, ওরে অ রতন, রতন রে—

ভেতর দিক্ থেকে আওয়াজ আসে, যাই বাবু—

হাঁটুর ওপর কাপড়-পরা গেঞ্জি-গায়ে প্রৌঢ় রতন এসে বললো ডাকছেন কর্তাবাবু?

—হুঁ। আমার টোব্যাকোর কৌটোটা এনে দে তো বাবা।

রতন টোব্যাকো পৌঁছে দিয়ে গেল।

পাইপে টোব্যাকো দিয়ে আগুন ধরিয়ে রাজেনবাবু আবার বলতে শুরু করলেন, আমি তো ঐরকম অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়েছি, আর এদিকে আমাদের তাঁবুর কি খবর শোন। অবশ্য অসীম-উৎপলের মুখ থেকেই পরে আমি এ খবর শুনেছিলাম।

পৌনে বারোটা নাগাদ সোনা আবার ঘড়ি দেখতে ঢুকেছিল তাঁবুর মধ্যে। ঢুকতেই সর্বপ্রথম তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল আমার শূন্য বিছানাটা। বিছানা খালি দেখে সে তখুনি আবার তাঁবুর বাইরে গিয়েছিল। তাঁবুর চারদিকটা একবার ঘুরে আমার দেখা না পেয়ে সে আমার নাম ধরে কয়েকবার চিৎকার করেছিল। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে সে ছুটে তাঁবুর মধ্যে এসে উৎপল, অসীম এবং অপর কুলি দুজনকে ডেকে তুলেছিল, এবং আমার অন্তর্ধানের কথা জানিয়েছিল।

অসীমই প্রথম আমার চিঠিখানা আবিষ্কার করেছিল। চিঠিখানা পড়তেই সব রহস্যের সমাধান হয়ে গেল ওদের কাছে। অতঃপর ওরা সকলে মিলে পরামর্শ করতে বসলো, কি করা যায়?

'কি করা যায়'—একথা ভাবতে ভাবতেই ওরা সারা রাতটা কাটিয়ে দিল। আমি সত্যিই ভেলা নিয়ে ওপারে চলে গেছি কিনা, এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হবার জন্য কেউ একবার নদীতীরে যাওয়ারও প্রয়োজন বোধ করেনি! প্রয়োজন বোধ করলেও সাহসে কুলায়নি। স্রেফ ভূতের ভয়!

শৈলেন বললো, ওঃ! আশ্চর্য ভয় বটে!

দীপক বললো, যেমনি আশ্চর্য ভয়—তেমনিই আশ্চর্য বন্ধুত্ব! আমি হলে অমন বন্ধুদের জীবনে কোনদিন মুখদর্শন করতাম না! এমন ঘটনার পরও দাদু কিন্তু ওঁদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখেছিলো! —দাদুটা যেন কী!

শৈলেন জিজ্ঞেস করলো, ওঁরা দুজন এখনো বেঁচে আছেন দাদু?

—অসীম মারা গেছে শুনেছি······উৎপলের খবর জানি না। সাত আট বছর আগে ওর একখানা চিঠি পেয়েছিলাম, তারপর আর কোন সংবাদ পাইনি।······তারপর শোন; ভোর হতেই ওরা সকলে সশস্ত্র হয়ে বেরিয়ে পড়লো আমার অনুসন্ধানে। নদীর ধারে পৌঁছে ভেলাটা দেখতে পেল ওপারে। একজন কুলি সাঁতরে গিয়ে ভেলাটা নিয়ে এলো, তারপর শুরু হলো সকলের যাত্রা।

ওপারে পৌঁছে ভেলাটা ওরা বেঁধে রাখলো। চারদিক বেশ ফরসা হয়ে গেছে। স্পষ্ট দিবালোকে ওরা বীরত্ব দেখাবার সুযোগ পেল। কারণ দিনের আলোয় ভূতের ভয় দূর হয়ে গেছে। তাছাড়া পাতলা জঙ্গল—হিংস্র জন্তু-জানোয়ারেরও এখন আর খুব বেশী ভয় নেই। কাজেই ওরা বীরদর্পে হৈ-হৈ করে সম্মুখ দিয়ে এগিয়ে চললো। মাঝে মাঝে বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করতে লাগলো—যদি সেই আওয়াজ আমার কানে পৌঁছায়, যদি সেই আওয়াজের প্রত্যুত্তর দিই—এই আশায়। কিন্তু প্রায় দু ঘণ্টা বনে বনে ঘুরে এবং দশ-বারোটা ফাঁকা আওয়াজ করেও তারা আমার কোন সন্ধান না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরতে লাগলো তাঁবুর পথে। তাদের ভৌতিক আলোচনাও দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কান্নার শব্দ অনুসরণ করে আমি যে মহা গোঁয়ারতুমির কাজ করেছি, একথা প্রত্যেকেই বার বার

বলতে লাগলো। এবং আমি যে আর বেঁচে নেই, এ ব্যাপারেও প্রত্যেকেই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল!

এই ধরনের জল্পনা কল্পনা করতে করতে তারা ফিরছে, এমন সময় তাদের নজরে পড়লো আমার বন্দুকটা। বড় একটা ঝোপের পাশে সেটা পড়ে ছিল। বন্দুকটা পেয়ে ওদের চিন্তা-ধারার গতি পালটালো। ভূতের হাতে আমার মৃত্যু হলে আমার লাশটাও ঐ বন্দুকের কাছেই পড়ে থাকতো নিশ্চয়! সুতরাং অন্য কিছু ব্যাপার। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও তারা কাছাকাছির মধ্যে আমার বা আমার লাশের কোন খোঁজই পেল না।

॥ তিন ॥

এবার শোন আমার কি অবস্থা হয়েছিল। সেই ঝোপটার কাছে পৌঁছাতেই তো কান্নার শব্দ সহসা থেমে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কেমন যেন একটু ভয়ও পেলাম। কিন্তু কোন কিছু বুঝবার আগেই আমি বন্দী হয়ে গেলাম প্রায় চার পাঁচ জন লোকের হাতে। তারা সংখ্যায় ঠিক ক'জন ছিল, তা বুঝতে পারিনি।

লোকগুলো আশ পাশের ঝোপের আড়ালেই লুকিয়ে ছিল বুঝলাম। দেখবার কিছু অবকাশ পেলাম না। কারণ আমাকে ঝাপটে ধরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওরা আমার চোখ বেঁধে দিল। তারপর বন্দুকটা হাত থেকে নিয়ে ফেলে দিল ছুড়ে। ভগবানকে অশেষ

ধন্যবাদ যে, রিভলভারটা আমার কোমর থেকে খুলে নেয়নি, এবং ঐ ধস্তাধস্তির মধ্যে চর্চটাও পকেটের মধ্যে রাখতে পেরেছিলাম।

চোখ বাঁধার পর আমার মুখ বাঁধা হল। তারপর দুশমনেরা আমার হাত-পা বাঁধলো। এতক্ষণে কান্নার রহস্য কিছুটা স্পষ্ট হল।

যাত্রা শুরু হল অতঃপর। তিনজন লোক আমাকে কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে এগিয়ে চললো। কোন্ দিকে চলেছি, কিছু বুঝলাম না। দেহে মাঝে মাঝে ডালপালার আঁচড় লাগছে।

অনেকটা পথ অগ্রসর হয়ে দুশমনেরা থামলো। তারপর সন্তর্পণে যেন কিসের ওপর শুইয়ে দিল আমাকে। আমার শরীরটা দুলতে লাগলো। তবু আমি তখুনি ঠিক ব্যাপারটা অনুমান করতে পারলাম না—বুঝলাম একটু পর দাঁড় টানার ছপছপ আওয়াজ শুনে।

প্রায় আধঘণ্টা কিংবা আরও কিছু বেশী সময় চলার পর নৌকা থামলো। নৌকা থেকে আমাকে নামিয়ে আগের মতই তিনজনে কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলো। বেশ বুঝতে পারলাম, ক্রমশঃ ওরা উঁচুদিকে উঠছে এবং খুব সাবধানে উঠছে। বোধ হয় সংকীর্ণ খাড়াই পথ—তাড়াতাড়ি চলতে গেলে পতনের আশঙ্কা আছে! মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে ওরা কথা বলছে বটে —কিন্তু ভাষা বুঝছি না।

এবারও ওরা প্রায় আধঘণ্টা অগ্রসর হওয়ার পর থামলো। এই আধঘণ্টায় ওরা খুব বেশী পথ আসতে পেরেছে বলে মনে হল না।

এবার কাঁধ থেকে আমাকে নামিয়ে রুক্ষ জমির ওপর শুইয়ে দিল এবং হাত, পা ও মুখের বাঁধন খুলে দিল। শুধু চোখের বাঁধনটা রইলো। হাত-পায়ের বাঁধন থেকে মুক্ত হতে যেমন একটু স্বস্তি

পেলাম, তেমনি আমার ভাগ্যের পরিণতি ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসছে ভেবে উদ্বিগ্নও হলাম। অবশ্য পরিণতি যে কি, সে সম্পর্কে তখন আমার বিন্দুমাত্রও ধারণা ছিল না।

বাঁধন খুলে দিয়ে লোকগুলো আমার কাছ থেকে চলে গেল বলে মনে হয়। চলে যাওয়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর কানে এলো ভারী পাথর সরানোর শব্দ। সহসা চোখের বাঁধন খুলতেও সাহস পেলাম না, হয়তো ওরা ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে আঘাত করতে পারে, এই আশঙ্কায়।

একটু পরেই পাথর সরানোর শব্দ থেমে গেল। আমি কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে মানুষের উপস্থিতি উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলাম —মনে হল কাছাকাছি কেউ আর নেই। অতঃপর ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে বসলাম এবং চোখের বাঁধন খুললাম। কিন্তু কিছুই আমার নজরে পড়লো না—নিবিড় অন্ধকারে দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেল।

টর্চ রয়েছে পকেটে। জ্বালতে সাহস পেলাম না। অনেকক্ষণ হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে রইলাম। কান দুটো সজাগ হয়ে রইলো। মাঝে মাঝে দূর থেকে খুটখাট শব্দ এবং অপরিচিত ভাষার কথাবার্তা কানে আসতে লাগলো। এসব ঐ দুশমনদেরই কীর্তি, সেবিষয়ে সন্দেহ রইলো না।

কতক্ষণ ঐভাবে বসে ছিলাম স্মরণ নেই। একসময় বুঝলাম, কথার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে, জনমানবের উপস্থিতি আর টের পাওয়া যাচ্ছে না। তখন পকেট থেকে টর্চটা বের করে মুহূর্তের জন্যে একবার জ্বেলে হাতের ঘড়িটা দেখে নিলাম। রাত তখন পুরো তিনটে।

আরও কিছুক্ষণ সজাগ হয়ে রইলাম। নাঃ, কোন সাড়াশব্দই আর কানে আসছে না। রাত্রের মধ্যেই আমার কাছে আর মানুষের আবির্ভাব ঘটবে বলেও মনে হয় না। কিছুটা সাহস পেয়ে টর্চ জ্বেলে এবার চতুর্দিকে তাকালাম। বুঝলাম পাহাড়ের গুহায় আমি বন্দী হয়েছি।

গুহাটা খুব বড় নয়। ছোট গুহা। অনেকটা কয়েদখানার মত। অনেকক্ষণ ধরে গুহাটার মধ্যে ঘোরাঘুরি করে, বেশ মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেও ওখান থেকে মুক্তিলাভের কোন পথই খুঁজে পেলাম না। গুহার মুখটা খুব সরু। বেশ বড় ভারী একটা পাথর চাপা দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিয়েছে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম, সাড়ে তিনটা বেজে গেছে। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত···একটু পরিষ্কার জায়গা দেখে শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে দুচোখ জুড়ে ঘুম নেমে এলো।

বেশীক্ষণ ঘুমুতে পারিনি। হঠাৎ একসময় ছ্যাঁত করে ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘড়িতে তখন সাড়ে চারটে। প্রথমটা ভেবেছিলাম, নিজেদের বাড়িতে নিজেরই বিছানায় বুঝি শুয়ে আছি। অবশ্য সে ভুল ভাঙতে মোটেই দেরি হল না। মুহূর্তকয়েক নিজের বর্তমান অবস্থার কথা ভেবে আবার চোখ বুজলাম। রাত্রি জাগরণ আর শারীরিক অবসাদের জন্য চোখের পাতা দুটো টনটন করছে। ঘুমের দাপটে দুচোখ আড়ষ্ট হয়ে আছে। তখুনি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

এবার প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা ঘুমুবার পর বেলা নটায় ঘুম ভাঙলো। গুহার অন্ধকার ফিকে হয়ে গেছে। গুহার মুখে যেখানে

পাথর চাপা দিয়েছে তুশমনেরা, সেখান দিয়ে আলো আসছে। উঠে দাঁড়ালাম····· আবার মুক্তির পথের অনুসন্ধান করতে লাগলাম।

গুহার অভ্যন্তরভাগের শেষ সীমান্তে যেতে চোখে পড়লো, পাশের একটা সরু ফাটল দিয়ে সূর্যের আলো এসে গুহার মধ্যে পড়েছে। একটা বড় পাথরের টুকরোর ওপর দাঁড়িয়ে ফাটলের কাছে চোখ রাখলাম। দেখতে পেলাম সুনীল আকাশ। আঃ, আকাশ যে এত সুন্দর, এর আগে তা কোনদিন উপলব্ধি করিনি।

কাছাকাছি জায়গা ফাঁকা। অনেকটা দূরে ঘন সন্নিবিষ্ট গভীর বনানীশ্রেণী দেখতে পেলাম। মনে পড়লো সঙ্গীদের কথা। ওরা নিশ্চয় আমাকে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। নানা তুর্ভাবনায় সকলেই অস্থির হয়ে উঠেছে বুঝতে পারলাম। হয়তো ভাবছে, আমি আর বেঁচে নেই—ভূতের হাতে প্রাণ দিয়েছি। কিন্তু তাদের সে তুর্ভাবনার অবসান ঘটাবার কোন উপায়ই দেখছি না। যদি কোন রকমে তাদের কাছে একটা খবর পাঠাতে পারতাম যে, আমি মরিনি, বেঁচে আছি তাহলে আমিও খানিকটা স্বস্তি পেতাম, তারাও কিছুটা সুস্থ হতে পারতো।

ওদের কথা ভাবতে ভাবতে নিজের অবস্থার চিন্তায় আবার ফিরে এলাম। দূরের বনানীর শীর্ষ দেশ এবং পাহাড়ের ছোট ছোট চূড়াগুলো সূর্যের আলোয় অপরূপ দেখাচ্ছে! মনে হতে লাগলো, গুহা-প্রাচীর ভেঙে চুরমার করে দিয়ে এখুনি ঐ আলোর বন্যার মাঝখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি!

আচমকা মনে একটা চিন্তা জাগলো। বেশ ভাল করে লক্ষ্য

করলাম, পাহাড়ের যেখানটায় ফাটল ধরেছে, সেই জায়গাটার পাথর অত্যন্ত পাতলা এবং সেই পাতলা পাথরের গায়ে সরু সরু আরও কয়েকটা ফাট ধরেছে দেখতে পেলাম। বুঝলাম, জায়গাটা তেমন মজবুত নয়। ভারী একটা পাথর দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করলে হয়তো পাতলা অংশটুকু ভেঙে গিয়ে একটা গহ্বরের সৃষ্টি হতে পারে।

ঠিক এমনি সময় গুহা-মুখের পাথর সরানোর শব্দ পেয়ে আমি সচকিত হয়ে সেখান থেকে সরে এলাম। তারপর একটা পাথরের টুকরোর ওপর বসে দেখতে লাগলাম দুশমনদের কীর্তি! বিরাট পাথরটা একটু একটু করে সরছে······

গুহা-দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হলে বল্লমজাতীয় অস্ত্র হাতে নিয়ে তিনজন দুশমন ভেতরে প্রবেশ করলো। ওদের চেহারা দেখবার সুযোগ পেলাম এবার। দুশমনের মতই বিশাল দেহাকৃতি। মুখে বড় বড় দাড়ি গোঁফ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, আর কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। প্রথমে ভেবেছিলাম, অসভ্য বুনো জাত হবে হয়তো। আমাকে ধরে নিয়ে আসার অর্থ—হয়তো আমাকে আগুনে পুড়িয়ে আমার মাংস খাবে। কিন্তু ওদের চেহারা দেখে আমার সে-সন্দেহ দূর হল। কাপালিক কোনদিন দেখিনি। না দেখলেও কাপালিকদের চেহারার যে বিবরণ আমার শোনা ছিল, তাতে এদের কাপালিক বলেই মনে হল।

ঐ তিনজনের পিছু পিছু একই রকম চেহারার আরও একজন লোক প্রবেশ করলো। তার দুহাতে দুটি মাটির পাত্র। অপেক্ষাকৃত ছোট পাত্রটিতে জল রয়েছে বোঝা গেল—অপর পাত্রটিতে কি রয়েছে

ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে অনুমানে মোটামুট্রি বুঝলাম যে, আমার খাবার আসছে।

অস্ত্রধারী লোক তিনজন আমার কিছুটা তফাতে স্থির হয়ে দাঁড়ালো, অপর লোকটি এগিয়ে এসে পাত্র দুটি নামিয়ে দিল আমার সামনে। ছোট পাত্রটিতে জল আছে আগেই বুঝেছিলাম, অপর পাত্রটির দিকে চেয়ে তো আমার মেজাজ বিগড়ে গেল।

দেখলাম ছোট ছোট কয়েকটা অদ্ভুত রকমের ফল—ঐ রকম ফল আমি জীবনে কোনদিন চোখে দেখিনি। ঐ ফল আর কিছুটা কালচে রঙের মাংস। কিসের মাংস তা বুঝবার উপায় নেই—তবে আগুনে পোড়ানো মাংস সেটা বুঝতে পারলাম। মাংসের অবস্থা দেখে তো আমার গা বমিবমি করতে লাগলো। খাওয়া তো দূরের কথা—পাত্রের দিকে চাইতেও ঘৃণা হয়!

খাবার দিয়ে ওরা প্রত্যেকেই চলে গেল এবং আগেকার মতই গুহার দ্বারটা সেই বিরাট পাথরটা দিয়ে বন্ধ করে দিল। অত্যন্ত ভারী পাথর। আমার একার শক্তিতে সে পাথর নড়ানো সম্ভব নয়। চেয়ে চেয়ে দেখলাম, ওরা চারজনে প্রবল শক্তি প্রয়োগ করে পাথরটাকে গুহার মুখে বসিয়ে দিল।

আমার কাছে যে রিভলভারটা ছিল, পূর্বেই দেখেছি তাতে মাত্র দুটো গুলি আছে। উত্তেজনার বশে তাঁবু থেকে বেরুবার সময় গুলি নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। যদি সঙ্গে আরও গুলি থাকতো, তাহলে এখুনি যাহোক কিছু একটা দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলতাম। কিন্তু মাত্র দুটো গুলি নিয়ে চারজন অস্ত্রধারী হিংস্র লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করা চলে না। তাছাড়া ঐ চারজন ছাড়া বাইরে ওদের আরও

সাঙ্গোপাঙ্গ আছে নিশ্চয়—তারাও ছুটে আসবে। কাজেই মাত্র ছটো গুলিতে আমি কি করতে পারি ওদের? গুলি ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মরতে হবে আমাকেও!

যদিও আমি অনুমান করে নিয়েছি যে, হত্যা করবার জন্যই এখানে আমাকে আনা হয়েছে, তবে সে মৃত্যুর হয়তো এখনো কিছু বিলম্ব আছে। যতক্ষণ না মরছি, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে পারবো—এটাই আমার সান্ত্বনা।

কাপালিকদের প্রকৃতি-সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও, গল্পে শুনেছিলাম, ওরা নাকি ভয়ংকর হিংস্র হয়, এবং কালীপ্রতিমার সামনে বলি দেবার জন্যেই নাকি ওরা মানুষ সংগ্রহ করে। তাই ওদের কাপালিক বলে সন্দেহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমার ধারণা হয়ে গেছে, বলি দেবার উদ্দেশ্যেই ওরা ধরে এনেছে আমাকে।

গুহা-দ্বার বন্ধ হতে আমি আবার সেই ফাটলটার কাছে ছুটে গেলাম। মুক্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষায় আমার সমস্ত শরীর গরম হয়ে উঠলো। মনে হতে লাগলো, এখুনি একটা ভারী পাথর তুলে নিয়ে ফাটলটার মুখে আঘাত করি। কিন্তু মনের উন্মাদনা মনেই চেপে রাখতে হল। কারণ ছশমনেরা এখন নিশ্চয় আশে-পাশে আছে, শব্দ পেলেই ছুটে আসবে। তাছাড়া শব্দ না পেলেও—এতটা পিছন থেকে শব্দ না পেলেও না পেতে পারে—কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহে ও-পথে যদি মুক্তিলাভ সম্ভব হয়, মুক্তিলাভের পর প্রকাশ্য দিবালোকে আমি কখনই ওদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারবো না। অগত্যা আরও কিছুক্ষণ ফাটল দিয়ে বাহিরের মুক্ত পৃথিবীর দিকে চেয়ে থেকে

সেখান থেকে সরে এলাম। মনে মনে স্থির করলাম, রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এলে মুক্তিলাভের চেষ্টা করবো।

॥ চার ॥

আমার রিস্টওয়াচে রাত তখন নটা।

সন্ধ্যার পর থেকেই গুহাদ্বারের কাছে কান দুটোকে সজাগ রেখে দাঁড়িয়ে আছি। গুহার বাইরে দুর্বৃত্তদের কথোপকথনের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ ওরা আমাকে খাবার দিয়ে গেছে। দিয়েছিল কতকগুলো ফল, খানকয়েক রুটি, আর ঘন করে জ্বাল দেওয়া খেজুরের রস। সব খেয়েছি। ঘৃণার সঙ্গে খেলেও খেতে নেহাত খারাপ লাগেনি। ফলগুলো অদ্ভুত রকমের হলেও খেতে ভাল। বেশ মিষ্টি এবং সুস্বাদু। সকালের দিকেও ফলগুলো খেয়েছিলাম।

রাত আটটা বেজে পাঁচ মিনিটের সময় ওদের শেষ কথাবার্তার শব্দ আমার কানে এসেছে। তারপর এখনো পর্যন্ত আর কোন সাড়াশব্দ পাইনি। চতুর্দিক নিঝুম—মড়ার মত অসাড়। ঝিল্লীর অশ্রান্ত চিৎকার আমার কান দুটোকে বধির করে দিতে চাইছে যেন! মাঝে মাঝে বহু দূর থেকে বন্য পশুদের গর্জন ভেসে আসছে।

এই এক ঘণ্টা যাবৎ দুর্বৃত্তদের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে বেশ কিছুটা সাহস পেলাম মনে। নিশ্চয় ওরা কাছেপিঠে কেউ নেই—কোথাও গেছে হয়তো। হয়তো শিকারেই গেছে। শিকারে যদি

গিয়ে থাকে সে তো আমার পরম সৌভাগ্য! কিংবা হয়তো কাছেপিঠে কোথাও ঘুমুচ্ছে।

কিছু সময় অস্থিরপদে পায়চারি করে আবার গুহাদ্বারের কাছে কান পেতে দাঁড়ালাম। প্রায় পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম—কিন্তু বাইরে জন-মনিষ্যির অস্তিত্ব টের পেলাম না। টর্চের আলো জ্বেলে এবার অগ্রসর হলাম সেই ফাটলটার দিকে। আমার কাজের যাতে সুবিধা হয়, এই রকম জায়গায় টর্চটা জ্বলন্ত অবস্থায় রেখে বেশ ভারী একটা পাথরের টুকরো খুঁজে নিয়ে আঘাত করতে লাগলাম ফাটলের মুখে।

দু-চারবার ঘা মেরেই ছুটে এলাম গুহাদ্বারের কাছে। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলাম, দুর্বৃত্তদের সাড়াশব্দ পাওয়া যায় কিনা? টুঁ শব্দটি পেলাম না। ফিরে এসে আবার আঘাত করতে শুরু করলাম।

জায়গাটা সত্যই তেমন মজবুত ছিল না। একটু পরেই বেশ বড় একটা পাথরের টুকরো হুড়মুড় শব্দে খসে পড়লো। মানুষ বেরুতে পারে, এমন একটা গহ্বরের সৃষ্টি হল। হাতের পাথরটা রেখে তাড়াতাড়ি টর্চ নিয়ে গহ্বর-পথে মুখ বাড়িয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। টর্চের আলোয় দেখলাম, প্রায় পাঁচ হাত নীচে পাহাড়ের বুকে ছোট ছোট লতাগুল্মে ভরা খানিকটা সমতল জায়গা। লাফ দিয়েও খুব বেশী আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এমন সময় গুহামুখের পাথর সরানোর শব্দ কানে এলো। ভয়ংকর চমকে উঠলাম। পিছনে চেয়ে দেখি, পাথরটা একটু একটু করে সরছে, আর মশালের লাল আলোর আভা স্পষ্ট হচ্ছে। নাঃ,

আর দেরি করা চলে না—এক মুহূর্তও নয়। টর্চটা কোমরে গুঁজে লাফ দিলাম।

ত্রই হাঁটুতে বেশ চোট লাগলো। হাতের তালু ত্রটোতেও ডালপালার খোঁচা লেগে খুব জ্বালা করতে লাগলো। হাঁটতে গিয়ে দেখি রীতিমত খোঁড়াতে হচ্ছে!

পায়ের এইরকম অবস্থা নিয়ে দ্রুত চলা সম্ভব নয়। কিন্তু চলতেই হবে। এখুনি ত্রশমনেরা আমার পলায়নের সংবাদ পেয়ে দলবল নিয়ে আমার পেছনে ধাওয়া করবে। এবার যদি ওরা আমাকে ধরতে পারে, তাহলে নিশ্চয় ওরা আরও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে! আমার মুক্তিলাভের আর কোন উপায়ই থাকবে না।

এমন সময় ছোট ছোট লতাগুল্মের গায়ে লাল আলোর আভা দেখে পিছন ফিরে তাকালাম। যেখান দিয়ে আমি ঝাঁপ দিয়েছি, সেই গহ্বরপথে একটা জ্বলন্ত মশাল আর দাঁড়ি-গোঁফে ভরা একটা ভয়ংকর মুখ দেখতে পেলাম। লোকটাও আমাকে দেখতে পেয়েছে। আমাকে দেখেই সে তীব্রস্বরে চিৎকার করতে লাগলো। আমিও সমস্ত ব্যথা-যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে ছুট দিলাম।

ছুটতে লাগলাম বললে ভুল বলা হবে। ঝোপ-জঙ্গলে ভরা উঁচু-নীচু পাথরের ওপর দিয়ে ছোটা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কাজেই দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলাম বলতে পারি। চলতে চলতে অনেকটা পিছনে তিন-চারজনের মিলিত কণ্ঠের চিৎকার শুনতে পেলাম। পিছন ফিরে চেয়ে দেখলাম, পাঁচটা মশালের আলো দ্রুত এগিয়ে আসছে। পাথরের ওপর দিয়ে দ্রুত চলার ব্যাপারে ওরা আমার চেয়ে আরও বেশী অভ্যস্ত।

ইষ্টনাম স্মরণ করতে করতে আরও জোরে পা চালিয়ে দিলাম। প্রায় ছুটতে ছুটতেই চলেছি। যে কোন মুহূর্তে কঠিন পাথরে হোঁচট খেয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল—একটু পরেই সমতল পথ-রেখা পেয়ে গেলাম। সেই পথ ধরে ছুট দিলাম ঊর্ধ্বশ্বাসে। ওপথ যেখানে যতদূর গেছে, ততদূর ছুটে যাব—তারপর যা হয় হবে। ছুটছি আর এক-একবার পিছন ফিরে চাইছি। মশালের আলো ক্রমশঃই পিছিয়ে পড়ছে বলে মনে হতে লাগলো।

মাথার ওপর নক্ষত্রখচিত আকাশ। নক্ষত্রের আলোয় পথ আবছাভাবে যেটুকু দেখতে পাচ্ছিলাম, বিপদের এই সঙ্গিন মুহূর্তে সেইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

এইভাবে কতক্ষণ ছুটেছি জানি না, সহসা একসময় আমার মনে হল, আমি এক অন্ধকার রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছি। মনে হতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কেন জানি না, এক অদ্ভুত আতঙ্কে আমার সর্ব অঙ্গ অসাড় হয়ে এলো যেন! চতুর্দিকে চেয়ে দেখি, সত্যই আমি এক জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি! মাথার ওপর আকাশ নজরে পড়ছে না।

টর্চের আলো জ্বেলে বুঝলাম, এক গুহা থেকে মুক্তি পেয়ে আর এক গুহায় এসে প্রবেশ করেছি। এ গুহা সুবিশাল। দু পাশে পাথরের কঠিন প্রাচীর রয়েছে বটে, কিন্তু সম্মুখের দিকে আলো ফেলে গুহার কিনারা পেলাম না। তারপর পিছনের দিকে আলো ফেললাম—গুহাদ্বার নজরে পড়লো না। বুঝলাম অনেকখানি ভিতরে চলে এসেছি।

কিছু সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, এখুনি গুহা থেকে বেরুবো

কিনা? বেরুতে সাহস হল না। যদি ধরা পড়ে যাই তাদের হাতে? কিছুক্ষণ পরে বেরুলেই চলবে। কিন্তু এই 'কিছুক্ষণ' সময় কি করা যায়? স্থির করলাম, অভ্যন্তর ভাগটা একটু ঘুরে দেখে নিই। প্রথমে ঢুকতেই যে অদ্ভুত ভয় আমার মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, সে ভয় দূর হয়েছে। টর্চের আলো জ্বেলে সাবধানে এক পা এক পা করে ভেতরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। বাঁ হাতে টর্চ নিয়ে ডানহাতের মুঠোয় রিভলভারটা চেপে ধরলাম —প্রয়োজন হতে পারে! এইসব গুহায় হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের অবস্থান স্বাভাবিক।

কিছুটা অগ্রসর হয়ে দেখলাম, সম্মুখ দিকের পথটা ছাড়া ডানদিকে আর একটা নতুন গুহাপথ রয়েছে। দুই পথের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে ডানদিকের পথটা লক্ষ্য করতে লাগলাম। বুঝলাম এ পথটাও অনেক দূর চলে গেছে। এই নতুন পথে না গিয়ে আমি সামনের দিকেই আবার অগ্রসর হতে লাগলাম। মাত্র কয়েক পা অগ্রসর হয়ে এবার বাঁ দিকে আর একটা পথ দেখতে পেলাম। সামনের পথটা তেমনি সামনের দিকেই চলে গেছে।

নতুন কিছু জানবার আকাঙ্ক্ষা আমার ছোটবেলা থেকেই প্রবল। কী খেয়াল হল, এবার বাঁ দিকের পথ ধরে চলতে লাগলাম। যতই অগ্রসর হতে লাগলাম, ততই বিস্মিত হয়ে দেখতে লাগলাম যে, পথ ক্রমশঃই চওড়া হচ্ছে এবং আমার দুপাশ দিয়ে আরও অনেক পথ মাকড়সার জালের মত দুদিকে চলে গেছে। বেশ বুঝতে পারলাম, পাথর কেটে বেশ সযত্নে পথগুলো তৈরি করা হয়েছে। ভূতে-পাওয়া লোকের মত আমি আর একটা নতুন

পথ ধরে অগ্রসর হলাম। এরকম বিচিত্র গুহার কথা আমি কোনদিন শুনিনি।

এক পথ থেকে অন্য পথ, সে পথ থেকে আরেক পথ এমনি ভাবে কতক্ষণ চলেছিলাম খেয়াল নেই। সহসা একসময় আমার চেতনা হল, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি! সঙ্গে সঙ্গে পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেল—আমার সমস্ত শরীর আগুনের মত গরম হয়ে উঠলো। আমি তখনি ঐ আশ্চর্য গুহা থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলাম। এ পথ থেকে সেপথ, সেপথ থেকে আরেক পথ ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলাম। এমনিভাবে বহুক্ষণ ছুটোছুটি করেও গুহা থেকে বেরুবার পথ খুঁজে পেলাম না; বরং ক্রমশঃই যেন গুহার গোলকধাঁধায় বন্দী হয়ে গেলাম। মাকড়সারা যেমন জাল বিস্তার করে শিকার ধরে, এ গুহাও তেমনি আমাকে গ্রাস করবার জন্যেই যেন শতবাহু বিস্তার করে এখানে যুগ-যুগান্ত ধরে অপেক্ষা করছিল। শরীর খুব ক্লান্ত হয়ে গেছে···হতাশায় সমস্ত দেহ-মন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে···আর পা চলে না···আর কিছু ভাবতে পারি না···গুহাপথের ওপরেই এক জায়গায় পাথরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়লাম।

চতুর্দিকে জমাট বাঁধা অন্ধকার। দৃষ্টি চলে না কোনদিকে। মাত্র এক বিঘত দূরের জিনিসও দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে আমি অন্ধ হয়ে গেছি।

আমার মন তখন এমনই এক বিচিত্র অবস্থার মধ্যে এসে পৌঁচেছে যে, ভয়-ভাবনার নাগপাশ থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পেয়ে গেছি। ধীরে ধীরে আমার দু চোখে তন্দ্রার ঘোর নেমে এলো।

তখনও আমি নিদ্রাভিভূত হইনি। সহসা লালচে আলোর আভায় আমার বুজে-আসা চোখের পাতা খুলে গেল। এক পলকের জন্য দেখতে পেলাম একটি শ্বেতবসনা নারীমূর্তিকে। তার হাতে ছিল একটা নিবু-নিবু মশাল। মেয়েটি এক রাস্তা থেকে বেরিয়ে আর এক রাস্তায় ঢুকে গেল দ্রুত পায়ে।

চমকে উঠলাম। চোখ দুটো একবার ভাল করে রগড়ে নিলাম স্বপ্ন দেখছি মনে করে। আবার তাকালাম। লালচে আলোর আভা স্পষ্ট দেখতে পেলাম!······

॥ পাঁচ ॥

মানুষের দেখা পেয়েও আমি কিছুমাত্র নির্ভয় হতে পারলাম না। উপরন্তু কোন এক রহস্যের ফাঁদে আটকে গেছি ভেবে বেশ ভীত হয়ে পড়লাম! তখন আমার একমাত্র কামনা, ঐ অভিশপ্ত গুহা থেকে আমি মুক্তি চাই! কিন্তু বুঝতে পেরেছি, রাত্রির অন্ধকারে —টর্চ থাকা সত্ত্বেও—পথ আবিষ্কার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চেষ্টা করতে গেলে গুহার জটিল জালে বরং আরও আমাকে জড়িয়ে পড়তে হবে! সকাল হোক, সূর্যের আলোর আভায় যদি গুহার অন্ধকার কিছুটা দূর হয়, তাহলে হয়তো বেরুবার পথ আবিষ্কার করতে পারবো। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম রাত একটা! ভোর হতে এখনও অনেক দেরি। ক্লান্তি আর ঘুমের ঘোরে দুচোখের পাতা বুজে আসছে। আমি পথের একপাশে প্রাচীরের কোলে শুয়ে পড়লাম।

মেয়েটি কে, তা জানবার কৌতূহল জেগেছিল মনে। একবার ভেবেছিলাম অনুসরণ করি। কিন্তু শরীরের তখন এমনই অবস্থা

উঠতে ইচ্ছা হয়নি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমি সব কিছু ভুলে গিয়ে নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়লাম।

ঘুমের ঘোরে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্ন সাধারণতঃ অস্বাভাবিক এবং অদ্ভুতই হয়ে থাকে। কিন্তু আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলাম সে স্বপ্ন যেমন অদ্ভুত, তেমনই বিচিত্র এবং রহস্যময়! ঐ অদ্ভুত স্বপ্ন কেন দেখেছিলাম, আজ পর্যন্ত তার কোন ব্যাখ্যা আমি করে উঠতে পারিনি, এবং কয়েকজন মনস্তত্ত্ববিদ্‌কে জিজ্ঞাসা করেও সঠিক জবাব পাইনি! তোমরা চেষ্টা করে দেখতে পারো, স্বপ্নটার কোন নির্ভরযোগ্য অর্থ খুঁজে পাও কিনা?

স্বপ্ন দেখলাম, আমি চলেছি এক ভীষণ অরণ্যের মধ্যে দিয়ে। আমি একা চলেছি। সঙ্গে একটা অস্ত্র পর্যন্ত নেই! উদ্‌ভ্রান্তের মত চলেছি···কোথায় চলেছি তা জানি না।

চলতে চলতে রাত হয়ে গেল। কোন আশ্রয় না পেয়ে অন্ধকারে বন-ঝোপের মধ্যে দিয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছি। নিবিড় অরণ্য, তবু জন্তু-জানোয়ারের ভয় নেই প্রাণে। কিন্তু কী আশ্চর্য —ভূতের ভয়ে গা ছমছম করতে লাগলো। ভূতের ভয় বাস্তব জীবনে উপলব্ধি করিনি কোনদিন···এই প্রথম স্বপ্নে ভূতের ভয় পেলাম!

চলেছি তো চলেছিই! অনেক রাত হয়ে গেছে। অরণ্যও ক্রমশঃ গভীর হচ্ছে। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। এ অরণ্য থেকে বেরুবো কেমন করে? বিচলিত হয়ে আরও তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে লাগলাম।

চলতে চলতে একসময় উপলব্ধি করলাম, আমার খুব পিপাসা

পেয়েছে। ভূতের ভয় দূর হল, পথ-হারানোর আতঙ্ক দূর হল, জলের চিন্তায় ব্যস্ত হলাম। কোথায় জল পাওয়া যায়?

এমন সময় দেখি, আমার সম্মুখে এক বিরাট অট্টালিকা দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়ির ভেতর থেকে কোন মানুষের সাড়াশব্দ কানে আসছে না। তা না আসুক, এত বড় একটা ভাল বাড়ি, ভেতরে নিশ্চয় লোক-জন আছে। আর তাদের কাছে একটু খাবার জল চাইলে তারা নিশ্চয় আমাকে ফিরিয়ে দেবে না।

মনে মনে একথা ভেবে বিরাট ফটকটার মধ্যে দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। ওঃ, কী ভীষণ অন্ধকার! যতই বাড়ির ভেতর দিকে অগ্রসর হচ্ছি, ততই অন্ধকার বাড়ছে। অন্ধের মত অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি, এমন সময় চারিদিক্ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সহসা! থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কী সুন্দর সাজানো বাড়ি! কত লোকজন···তাদের গায়ে দামী দামী পোশাক ঝকমক করছে। বাড়ির দেওয়ালের গায়ে গায়ে হীরা-মণি-মুক্তা বসানো। বুঝলাম, এটা রাজার বাড়ি।

সত্যই তো, ঐ যে সিংহাসনে রাজামশাই বসে রয়েছেন। তুজন পরিচারিকা তাঁর তুপাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে পাখার হাওয়া করছে। অমাত্যগণ বসে রয়েছেন সারি সারি, সম্মুখে রয়েছেন অন্যান্য সভাসদেরা। রাজামশাই কী যেন বলছেন, সকলে তাই মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। বিচার-সভা বসেছে বোধ হয়। একটু পরেই অমাত্য এবং সভাসদ্দের আর দেখতে পেলাম না। শুধু রাজামশাই সিংহাসনে বসে রইলেন। তারপর সেখানে এলো একদল নর্তকী,

আর একটি অপূর্বসুন্দরী মেয়ে। মেয়েটিকে দেখে রাজামশাই ডাকলেন, এসো মা এসো।

বুঝলাম, মেয়েটি রাজকন্যা। রাজকন্যা ধীরে ধীরে রাজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, আর নর্তকীরা নাচতে লাগলো। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচ দেখতে লাগলাম।

ঠিক এমনি সময় বহুকণ্ঠের চিৎকার এবং শত শত ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেলাম। পরক্ষণেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বহু লোক এসে রাজা আর নর্তকীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। লোক-গুলোর একহাতে তলোয়ার আর একহাতে ঢাল। মাথায় সুন্দর পাগড়ি, গায়ে সৈন্যদের পোশাক। যে লোকটা সকলের আগে ছিল, তার পোশাক ঠিক সৈন্যদের মত নয়—অনেকটা রাজার মত পোশাক তার। এই রাজবেশী লোকটা ঘোড়া থেকে নেমে রাজকন্যার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরলো, আর কয়েকজন সৈন্য ছুটে গিয়ে রাজার মাথাটা কেটে ফেললো। অন্যান্য সৈন্যরা নর্তকীদের কেটে ফেলে দলবল নিয়ে অন্দরমহলে গিয়ে উপস্থিত হল। অন্দরমহলে যারা ছিল, সকলকে একে একে বধ করে সৈন্যরা আবার সেই রাজবেশধারী লোকটার কাছে এসে হাজির হল। সমস্ত প্রাসাদে রক্তের নদী বইতে লাগলো।

রাজবেশধারী পুরুষটি তখনো তেমনিভাবে রাজকন্যার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে ছিল, আর রাজকন্যা সকলকার মৃত্যু দেখে হাপুস নয়নে কাঁদছিল। সৈন্যরা হাজির হলে পুরুষটি তাদের বললো, আজ থেকে এই প্রাসাদ আমাদের। তোমরা

সকলে এই প্রাসাদেই থাকবে। আমি হবো এখানকার রাজা আর এই রাজকন্যা হবে আমার রানী।

সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ আনন্দে চিৎকার করে উঠলো, জয় মহারাজার জয়!

রাজকন্যা কিন্তু খুব রেগে গেল। সে রাজবেশধারী পুরুষটির দিকে কটমট করে চেয়ে বললো, বিশ্বাসঘাতক শয়তান! নরকেও তোর স্থান হবে না। ভেবেছিস আমি তোর রানী হব। তোর এ সাধ জীবনেও পূর্ণ হবে না!

রাজকন্যার কথা শুনে হোহো করে হেসে উঠলো লোকটা। তার হাসির শব্দে সমস্ত বাড়িটা কাঁপতে লাগলো। তারপর হাসি থামিয়ে সে রাজকন্যাকে বললো, আমার সাধ পূর্ণ হয় কিনা সাত-দিনের মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া যাবে। এখন এসো আমার সঙ্গে—তোমাকে বন্দী করে রাখা হবে!

এই কথা বলে লোকটা তাকে অন্দরমহলে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বন্দী করে রাখলো, তারপর দলবল নিয়ে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে বসে রাজকন্যা অনেকক্ষণ কাঁদলো। কিন্তু তার কান্না কেউ শুনতে পেল না। কে আর শুনবে? রাজপ্রাসাদে তো জনপ্রাণী নেই! শ্মশানের মত চারিদিক খাঁখাঁ করছে। এদিকে-ওদিকে চতুর্দিকে লোকজন মরে পড়ে রয়েছে!

আমি অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে সব দেখছি! ভয় খুব করছে আমার। একবার মনে হল, রাজকন্যাকে মুক্ত করে আনি। কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করলাম, নড়বার চড়বার শক্তি আমি হারিয়ে ফেলেছি।

এরপর যে দৃশ্য দেখলাম, তা আরও বীভৎস। দেখলাম, কাঁদতে কাঁদতে রাজকন্যা উঠে দাঁড়ালো, তারপর কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলতে লাগলো। একটু পর রাজকন্যার সেই ঝুলন্ত দেহ থেকে একটা আস্ত মানুষের কঙ্কাল বেরিয়ে ঘরের মেঝের ওপর দাঁড়ালো, তারপর কেমন ভাবে যেন ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো।

এমন সময় সেনাপতি আসছিল দলবল নিয়ে। কঙ্কালটাকে দেখেই তারা সকলে ভয়ে চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল। কঙ্কালটা এবার আমার দিকে তাকালো। তার চোখ দুটো দপদপ করে জ্বলছিল। দেখে আমার দেহের রক্ত আতঙ্কে হিম হয়ে গেল। মনে হল চিৎকার করি, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না।

এর পর কঙ্কালটা এক পা এক পা করে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। মনে হল আমার সমস্ত শরীর যেন অসাড় হয়ে আসছে। চেঁচাবার খুব চেষ্টা করতে লাগলাম, পারলাম না। কঙ্কালটা যখন আমার প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে, সেই সময় আমার কণ্ঠ দিয়ে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরুলো।

ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলাম, এবং হাঁপাতে লাগলাম। চোখের সামনে ঘোর অন্ধকার। চকিতের মধ্যে মনে পড়ে গেল আমি এক অজানা রহস্যময় গুহার মধ্যে আছি। কিন্তু ও কি? কিছুটা দূরে লাল আলো দেখা যাচ্ছে না? চোখ দুটো রগড়ে নিলাম। তারপর আবার তাকালাম। ঐ তো স্পষ্ট আলো। দপদপ করে জ্বলছে। কে যেন মশাল হাতে নিয়ে

আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। আমি উঠে দাঁড়ালাম···পিস্তলটা বেশ শক্ত করে চেপে ধরলাম ডান হাতে। দুটো গুলি আছে, প্রয়োজন হলে ব্যবহার করতে হবে!

কিছুটা নিকটবর্তী হলে বুঝলাম, সেই শ্বেত-বসনা নারী, যাকে চকিতের জন্যে একবার দেখেছিলাম। মেয়েটিকে আসতে দেখে আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করলাম। অপলক দৃষ্টিতে চাইতে লাগলাম তার দিকে। মেয়েটি ক্রমশঃই এগিয়ে আসতে লাগলো।

আমার কাছ থেকে মাত্র দুহাত তফাতে এসে মেয়েটি দাঁড়ালো। তার ডানহাতে দপদপ করে জ্বলছে মশাল। মেয়েটিকে এবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম। অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে। এমন সুন্দরী মেয়ে কোন দিন কোথাও দেখিনি। কিন্তু···হ্যাঁ দেখেছি! ঠিক এইরকম একটি মেয়ে এর আগেও নিশ্চয় কোথাও দেখেছি। না দেখলে মেয়েটির মুখখানা এমন চেনা চেনা মনে হচ্ছে কেন? যেন খুব চেনা মুখ!

হ্যাঁ মনে পড়েছে···আচমকা মনে পড়ে গেল। মনে পড়তেই সর্ব অঙ্গ ভয়ে শিরশির করে উঠলো আমার। মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে একটা হিমপ্রবাহ যেন বিদ্যুদ্বেগে বয়ে গেল। সারা দেহটা যেন ক্রমশঃই বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে আমার। স্বপ্নে-দেখা সেই রাজকন্যার সঙ্গে এই মেয়েটির হুবহু মিল!···

॥ ছয় ॥

আমি ভীতি-বিহ্বল চোখে চেয়ে আছি মেয়েটির মুখের দিকে। কতক্ষণ চেয়ে ছিলাম জানি না, খেয়াল হল মেয়েটির কথায়। মেয়েটি একটু ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করলো, এই গুহার মধ্যে এসেছেন কেন? আশ্রয়ের জন্যে?

আমি যেন সংবিৎ ফিরে পেলাম। একটা ঢোক গিলে ইতস্ততঃ কণ্ঠে বললাম, হ্যাঁ···ন্‌না···আশ্রয়ের জন্যে আসিনি; পথ ভুল করে চলে এসেছি এখানে। কিন্তু···

—গুহা থেকে আর বেরুতে পারছেন না বুঝি?

—হ্যাঁ, তাই। যদি দয়া করে বেরুবার পথটা দেখিয়ে দেন—

আমি অনেকটা সাহস পেয়ে গেছি মেয়েটির মিষ্ট কথায়। তাই আবার বললাম, বহুক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি করেছি······ খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি······কিন্তু বেরুবার পথের সন্ধান পাইনি!

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, কোথায় থাকেন আপনি? কেনই বা এসেছেন এদিকে?

—বলছি; একটু জল দিতে পারেন···খাবার জল? বড্ড পিপাসা পেয়েছে···জল না খেয়ে কথা বলতে পারছি না।

—একটু অপেক্ষা করুন—জল আনছি।

মেয়েটি চলে গেল। স্বপ্নের কথা মনে পড়লো আবার।

স্বপ্নের শুরু থেকে শেষ—সব মনে পড়লো। স্বপ্নের সেই রাজ-কন্যা…কিন্তু এ কেমন করে সম্ভব হয়? স্বপ্নের রাজকন্যার সঙ্গে এই মেয়েটির মুখের এমন হুবহু মিল কেন দেখতে পাচ্ছি? কেন জানি না, আবার আমার সারা দেহ ভয়ে হিম হয়ে আসতে লাগলো। মনে হল এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে আর এক জায়গায় আত্মগোপন করি—মেয়েটির সঙ্গে আর দেখা করবো না। পরক্ষণেই ভাবলাম, তাতে ফল্ বিশেষ শুভ হবে না—মেয়েটির কাছ থেকে উপকৃত হবার সম্ভাবনা আছে।

একটি মাটির পাত্রে করে মেয়েটি জল নিয়ে এলো। আমি দুহাত বাড়িয়ে পাত্রটি গ্রহণ করে এক নিশ্বাসে সমস্ত জলটুকু পান করলাম।

মেয়েটি আমার সম্মুখে বসে জিজ্ঞেস করলো, আপনি বোধ হয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন? একটু আগে আমি আপনার কাছে আর একবার এসেছিলাম, তখন আপনি ঘুমুচ্ছিলেন। আপনার মুখের হাবভাব দেখে আমার মনে হয়েছিল, আপনি স্বপ্ন দেখছেন।

বললাম, সত্যিই তাই …আমি স্বপ্নই দেখছিলাম…খুব অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি!

মৃদু হেসে মেয়েটি প্রশ্ন করলো, কি রকম স্বপ্ন? ঠিক আমারই মত দেখতে একটি মেয়ের স্বপ্ন?

আমি চমকে উঠে বললাম, কেমন করে জানলেন একথা? আমি সত্যই অবিকল আপনার মত একটি মেয়েকে স্বপ্নে দেখেছি!

—মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে, এইরকম স্বপ্ন দেখেছেন বোধ হয়?

—হ্যাঁ!

আমি রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু আমার স্বপ্নের কথা আপনি জানতে পারলেন কেমন করে? এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার!

মেয়েটি আমার কথার জবাব না দিয়ে বললো, এর আগে আরও অনেকে ঠিক আপনার মতই পথ ভুল করে এই গুহার মধ্যে এসে পড়েছিল—কেউ বা স্বেচ্ছাতেও এসেছিল—গুহার ভেতরটা দেখবার বাসনা নিয়ে। তারপর তারা ঠিক আপনার মতই শেষ পর্যন্ত বেরুবার পথ খুঁজে না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, এবং প্রত্যেকেই তারা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমার মত দেখতে একটি মেয়েকে স্বপ্নে দেখেছিল। ওই মেয়েটি নাকি রাজার মেয়ে···এবং মেয়েটি নাকি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে! আপনিও বোধ হয় এইরকম স্বপ্নই দেখেছেন?

—হ্যাঁ, ঠিক ওইরকম স্বপ্ন!

তারপর আমি স্বপ্নের সমস্ত গল্পটা মেয়েটিকে শুনিয়ে দিলাম। মেয়েটি চুপচাপ শুনলো, কোন কথা বললো না। গল্প বলা শেষ করে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু প্রত্যেকরই একই স্বপ্ন দেখার কারণ কি? আর স্বপ্নে আপনাকেই বা দেখছি কেন? আমার মনে হয়, এর মধ্যে কোন অদ্ভুত রহস্য লুকিয়ে আছে, আর সেই রহস্য-সম্বন্ধে আপনি বোধ হয় কিছু বলতে পারেন?

আমার কথার এবারও কোন জবাব না দিয়ে মেয়েটি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো, আপনার

কথা তো কিছু বললেন না আমাকে? এদিকে একা এসেছিলেন কেন? এই গুহার মধ্যেই বা কখন ঢুকলেন?

আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা আমি সংক্ষেপে বলে গেলাম।

শুনে মেয়েটি বললো, আপনি যাদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন, তারা এই গুহারই লোক। আপনি দৈবক্রমে এই গুহার মধ্যে এসে না পড়লেও তারা শেষ পর্যন্ত আপনাকে এখানেই পৌঁছে দিত। মানুষ শিকার করাই ওদের কাজ। কোন একজন বা দুজন মানুষকে নির্জনে পেলে ওরা তখুনি তাদের আক্রমণ করে বেঁধে নিয়ে আসতে পারে। আর সেরকম সম্ভাবনা যেখানে থাকে না, সেখানে ওরা নানা চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে শিকার করে।

আমি হতভম্বের মত প্রশ্ন করলাম, কেন ওরা মানুষ শিকার করে?

মেয়েটি অবিচলিত কণ্ঠে বললো, মানুষ শিকার করে ওরা কালী প্রতিমার সামনে বলি দেয় প্রত্যেক অমাবস্যার রাতে। এই গুহার মধ্যেই আছে সেই প্রতিমা—বিরাট ভয়ংকর মূর্তি! এক দুর্দান্ত হিংস্র কাপালিক ঐ মূর্তি পূজা করে।

—কোথায় থাকে সে কাপালিক?—আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো।

—এই গুহার মধ্যেই সে আছে—এই গুহাতেই সে থাকে।

—আর কে আছে?

—আর আছি আমি। আমি আর কাপালিক ছাড়া আর কেউ থাকে না এখানে।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করি, আপনার মত একটি মেয়ে ওইরকম দুর্দান্ত কাপালিকের সঙ্গে……

মেয়েটি বললো, এখান থেকে যদি চলে যাবার উপায় থাকতো, তাহলে যেতাম—সে উপায় নেই! কাপালিক তার মন্ত্রশক্তির জোরে আমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে। তার মন্ত্রশক্তির প্রভাবে সমস্ত গুহাটা মায়াময় হয়ে আছে। এই গুহার মধ্যে একবার যে প্রবেশ করে, সে আর কোনদিন এখান থেকে বেরুতে পারে না। আপনিও তাই বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। শত চেষ্টা করলেও আপনি এখান থেকে বেরুতে পারবেন না। এর আগে আপনার মত যত লোক এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছে, সকলেই গুহার মায়াজালে আটকা পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত নিহত হয়েছে কাপালিকের হাতে।

আমার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে উঠলো। বললাম, তাহলে উপায়?

আমার অবস্থা উপলব্ধি করে মেয়েটি বললো, অধৈর্য হবেন না! মৃত্যুকে একদিন বরণ তো করতেই হবে! সেই অনিবার্য মৃত্যুর জন্যে এতটা অধৈর্য হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমার সব কথা-গুলো মন দিয়ে শুনুন। এখান থেকে বেরুবার উপায় অবশ্য আছে। আপনি যদি কাপালিককে কোনও রকমে হত্যা করতে পারেন, তাহলে এই গুহার মায়া দূর হবে—আপনি বেরুতে পারবেন। আর দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, কাপালিক নিজে যদি আপনাকে সাহায্য করে, তাহলে বেরুতে পারবেন এখান থেকে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কাপালিক আপনাকে সাহায্য করবে না, তা তো বুঝতেই পারছেন—আপনি হচ্ছেন তার শিকার। সে আপনাকে বলি দেবেই। এই পূজারী কাপালিকও

গিরিগুহার রহস্য—



রাজকন্যার সেই ঝুলন্ত দেহ থেকে একটা আস্ত মানুষের কঙ্কাল বেরিয়ে ঘরের মেঝের ওপর দাঁড়ালো.......

হল সর্দার, আর যারা আপনাকে বন্দী করেছিল, তারা হল এর অনুচর। সর্দারের হুকুম মতই ওরা শিকার ধরে বেড়ায়। শিকার পেলে প্রথমে ওরা নিজেদের ডেরায় আটক করে রাখে—যেখানে ওরা আপনাকে আটক করে রেখেছিল, ওখানেই ওদের থাকবার জায়গা—তারপর অমাবস্যার দিন সন্ধ্যার সময় ওরা বলি পৌঁছে দিয়ে যায় এখানে! এই হল ওদের মোটা-মুটি কাজের ধারা! ওইভাবে প্রায় চারশো বছর ধরে একের পর এক কাপালিকরা এই গুহার মধ্যে কালীপ্রতিমার পূজা করে আসছে।

আমি বললাম, আপনিও কি পথ ভুল করে…

সে অনেক কথা, পরে বলবো। তবে এইটুকু এখন আপনি জেনে রাখুন যে, কাপালিকের দাসীরূপে আমি এখানে আছি, তার সমস্ত হুকুমই আমাকে পালন করতে হয়—না করে নিস্তার নেই। তার কথার অবাধ্য হলে নিদারুণ নির্যাতন সহ্য করতে হবে! এখন আমার একমাত্র কামনা এখান থেকে মুক্তি পাওয়া। কিন্তু কতদিন হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত মুক্তি পেলাম না। আপনার মত এর আগেও যাঁরা এখানে পথভুল করে এসে পড়েছিলেন, তাঁদেরও আমি সব কথা বলেছিলাম; কিন্তু কাপালিককে কেউ নিহত করতে পারেননি—শেষে তাঁরা নিজেরাই প্রাণ দিয়েছেন কাপালিকের হাতে।

একটু থেমে মেয়েটি আবার বলতে লাগলো, কোন্ সময় কাপালিককে নিহত করা সুবিধা, বলছি শুনুন। যদি পারেন নিহত করতে, আপনি আমি দুজনেই পরিত্রাণ পাব। কাপালিককে

নিহত করা চলে একটি মাত্র সময়ে—সে সময়টা হল তার পূজার সময়ে। প্রতি অমাবস্যার রাতে সে যখন পূজায় বসে, একমাত্র সেই সময়েই তাকে হত্যা করা যেতে পারে। মাসের মধ্যে মাত্র ওই চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় ছাড়া আর কোন সময় তার ক্ষতি করা একপ্রকার অসম্ভব বললেই হয়। কারণ প্রথমতঃ সে সব সময়েই মন্ত্রশক্তিতে শক্তিমান্ হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ সব সময় সে সশস্ত্র হয়ে চলাফেরা করে। আগামী কাল অমাবস্যা। কাল গভীর রাতে সে যখন পূজায় মগ্ন থাকবে, সেই সময় তাকে হত্যা করা সুবিধাজনক। কারণ পূজা আরম্ভ করার আগে সে তার সমস্ত মায়ার শক্তি দেবীর চরণে সমর্পণ করে স্বাভাবিক পূজারীর মন নিয়ে পূজায় বসে। পূজার শেষে সে আবার নিজের শক্তি গ্রহণ করে। এই মায়ার শক্তি শব-আরাধনা করে ও লাভ করেছে। প্রতিদিনই গভীর রাতে ও এই গুহার মধ্যে শব-আরাধনা করে—একমাত্র অমাবস্যার দিন বাদে। এখন সে শব-আরাধনা করছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, মাসের মধ্যে মাত্র ওই একটা দিনই কাপালিক প্রতিমার পূজা করে?

—হ্যাঁ, পূজা বলতে ওই একটা দিনই করে। অন্যান্য দিন কোনরকমে একটু ফুল-জল-বেলপাতা দিয়ে উঠে পড়ে—সে সময় তাকে নিহত করা সম্ভব নয়। যাই হোক আগামী কাল তো অমাবস্যা···কাপালিককে নিহত করবার মত মনোবল আপনার আছে কি?

বললাম, আছে।

মেয়েটি বললো, বেশ, তাহলে আসুন আমার সঙ্গে···এই একটা দিন যাতে আপনি কাপালিকের নজরে না পড়েন, সেই রকম থাকবার জায়গা আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমি মেয়েটিকে অনুসরণ করে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে বললাম, কাপালিককে নিহত করবার কৌশলটা আমাকে বলে দিন।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, কোন অস্ত্র আছে আপনার সঙ্গে ?

—আছে।

পিস্তলটা দেখিয়ে বললাম, মাত্র দুটো গুলি আছে এতে। কিন্তু একটা গুলিতেই ব্যাটাকে শেষ করতে পারবো মনে হয়।

পিস্তলটা নিয়ে মেয়েটি একটু নাড়াচাড়া করলো, তারপর ফিরিয়ে দিল আমার হাতে। ফিরিয়ে দিয়ে বললো, কেমন করে তাকে হত্যা করতে হবে, সেকথা কাল সন্ধ্যার পর আপনার সঙ্গে দেখা করে বলবো।

এই পর্যন্ত বলে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো, এবং মনোযোগ দিয়ে কী যেন শুনবার চেষ্টা করতে লাগলো। আমি প্রশ্ন করলাম, ব্যাপার কি ?

মেয়েটি তাড়াতাড়ি মশালের আগুন নিভিয়ে দিয়ে বললো, কাপালিকের শব-সাধনা শেষ হয়ে গেছে···এবার হয়তো আমাকে খোঁজাখুঁজি করবে। যে কোন মুহূর্তে সে আমাদের সামনে এসে পড়তে পারে···খুব সাবধানে নিঃশব্দে আমার পিছনে পিছনে আসুন—

॥ সাত ॥

চারিদিকে বিশ্রী অন্ধকার। অসহ্য অন্ধকাব।

এমন নিবিড় অন্ধকার জীবনে কোনদিন দেখিনি। পথ চল্‌তে যেমন অসুবিধা হচ্ছিল, তেমনই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। টর্চ জ্বালা নিষেধ। টর্চের আলো কাপালিকেব দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

মেয়েটি চলেছে আমাব মাত্র এক হাত দূবে দূরে। পরনে তার দুগ্ধ-শুভ্র বসন। কিন্তু সে বসন অত্যন্ত আবছাভাবে আমার নজরে পড়ছে। কোথায় কোন্‌দিকে চলেছি কিছুই বুঝছি না। শুধু জমাট-বাঁধা অন্ধকারের বুকে ক্ষীণ একটু শ্বেত কলঙ্ক-রেখা দেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি অন্ধের মত···

এবার ডানদিকে বেঁকুন।—মেয়েটি ফিসফিস কণ্ঠে বললো।

এতক্ষণ আমরা উভয়েই নীরব ছিলাম। মেয়েটিকে নীবব থাকতে দেখে আমি কথা বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না। এবার জিজ্ঞেস করলাম, এদিকে কাপালিকের আসার কি সম্ভাবনা আছে?

—আছে বইকি! সারা গুহা-প্রাসাদটার মধ্যে প্রায়ই সে ঘুরে বেড়ায়।

—ওর থাকবার নির্দিষ্ট জায়গাটা কোথায়?

—একেবারে অভ্যন্তর প্রদেশে। কালীপ্রতিমার মন্দিরও সেখানে।

—আপানি কোথায় থাকেন? কাপালিকের কাছেই?

—হুঁ!

আবার নীরবে পথ-চলা শুরু হয়।

কিছু পথ অগ্রসর হয়ে মেয়েটি থামলো। এবং আমাকেও দাঁড়াবার নির্দেশ জানিয়ে বললো, সামনে সিঁড়ি আছে, ওপরে উঠতে হবে। আপনার কাছে তো আলো আছে—আলোটা একবার জ্বেলে সিঁড়িটা দেখে নিন। জ্বেলেই নিভিয়ে ফেলবেন।

পলকেব জন্য একবাব টর্চ জ্বেলে সিঁড়িটা দেখে নিলাম। দেখলাম বিরাট চওড়া পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে। ওই সামান্য সময়ের মধ্যেই যেটুকু দেখবার অবকাশ পেলাম, তাতেই বুঝলাম, সুদক্ষ কারিগরের সুনিপুণ সৃষ্টি!

আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

গুহা আপনা থেকেই সৃষ্টি হয় জানি। এই গুহারও আদি সৃষ্টি প্রাকৃতিক সৃষ্টি বলেই মনে হয়। কিন্তু এমন অপূর্ব সিঁড়ি, এমন সুন্দর সুন্দর অসংখ্য পথ, তারপর কালীপ্রতিমার মন্দির —এসব তো প্রাকৃতিক সৃষ্টি নয়! ওপরে উঠতে উঠতে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, এমন গুহা কে তৈরি করেছিল বলতে পারেন? আর কেনই বা তৈরি করেছিল? কিছু জানা আছে আপনার?

মেয়েটি বললো, বহুদিন আগে একজন খামখেয়ালী রাজা এই গুহা-প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন। অগণিত ভাস্কর প্রায় দশ বছর যাবৎ একটানা পরিশ্রম করার ফলে গুহাটাকে এমন প্রাসাদের মত রূপ দিতে পেরেছে।

—বহুদিন অর্থাৎ কতদিন আগে?

—চারশো বছর আগে।

জিজ্ঞেস করলাম, রাজার এমন খেয়ালের কারণ কি?

—যাঁরা খামখেয়ালী, তাঁদের খেয়ালের কোন কারণ থাকে না।

জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর রাজধানী কি এখানেই ছিল?

—না, তিনি ছিলেন আসাম অঞ্চলের রাজা—সেখানেই ছিল তাঁর রাজধানী। এটা ছিল তাঁর শৈলাবাস। বছরের মধ্যে ন'মাস রাজধানীতে এবং তিন মাস এখানে বাস করতেন। সপরিবারেই তিনি আসতেন। দাস-দাসী, গায়ক-গায়িকা, নর্তক-নর্তকী এদেরও সঙ্গে নিয়ে আসতেন। ওই তিনটি মাস নৃত্য-গীতে, আনন্দ-উচ্ছ্বাসে, হই-হুল্লোড়ে মুখর হয়ে থাকতো এই গুহা-প্রাসাদ। সেদিনের সেই দিনগুলো আজও আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসছে!

আপনার চোখের সামনে ভাসছে?—আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

মেয়েটি বিব্রত হয়ে বললো, না, তা ঠিক নয়! মানে···ঘটনাটা আমি গল্পে শুনেছিলাম কিনা, ঠিক যেমন শুনেছিলাম, তেমনি একটা কল্পনার ছবি আমার চোখের সামনে যেন ভাসছে···এই আর কি!

সিঁড়ি শেষ হয়ে গেছে। আমরা প্রায় দেড়তলা সমান উঁচু জায়গায় এসে পৌঁচেছি। অনুভবে বুঝলাম, নীচেকার মত আমরা আবার সমতল পথে এগিয়ে চলেছি। মুহূর্তের জন্য একবার টর্চ জ্বেলে দেখলাম, দুপাশে প্রাচীর, মাথার ওপর প্রায় আট হাত উঁচুতে ছাদ, আর সম্মুখে চলে গেছে দীর্ঘ পথ! আমার

বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেছে। নীচে ওপরে সর্বত্রই অসংখ্য পথ! কিন্তু এ পর্যন্ত একটাও ঘর নজরে পড়লো না। ফিসফিসে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম মেয়েটিকে, শুধু রাস্তাই তো দেখছি। রাজামশাই সপবিবারে বাস করতেন···কিন্তু ঘর তো দেখতে পাচ্ছি না! এই রাস্তার ওপরেই বাস করতেন নাকি?

মেয়েটি হেসে বললো, উঁহু···ঘর আছে, একেবারে ভেতরের দিকে। অনেক ঘর আছে। এখন আপনাকে সে সব ঘর দেখাবার উপায় নেই। কারণ ওইদিকেই কাপালিক থাকে। কাল রাত্রে কাপালিক যখন পূজায় বসবে, সেই সময় তাকে হত্যা করবার জন্য আপনাকে নিয়ে যাব মন্দিরের কাছে···তখন আপনি গুহার অভ্যন্তরের চেহারা দেখতে পাবেন। এদিকে যা দেখছেন, এর চেয়ে সহস্রগুণ সুন্দর অভ্যন্তর প্রদেশ। রাজবাড়ি বলে মনে হবে আপনার।

বাঁ হাতে বেঁকে আবার একটা নতুন পথে চলতে শুরু করলাম আমরা।

নীরবে কিছুটা পথ অগ্রসর হওয়ার পর জিজ্ঞেস করলাম মেয়েটিকে, আপনার পরিচয়টা কিন্তু এখনো আমার জানা হয়নি? কী নাম আপনার? আপনার পিতৃপরিচয় কি? আর কেমন ভাবেই বা আপনি বন্দী হলেন কাপালিকের হাতে?

মেয়েটি বললো, আমার পরিচয় কিছু নেই। আর নাম? হ্যাঁ, আগে আমার একটা নাম ছিল বটে, সে নাম এখন আমি আর স্মরণ করতে পারি না। তবে কাপালিক আমাকে অঞ্জনা বলে ডাকে। আপনার যদি আমাকে ডাকবার ইচ্ছা হয় অঞ্জনা নামেই ডাকবেন।

আমি বললাম, দেখুন আপনার কথাগুলো কেমন যেন হেঁয়ালির মত মনে হচ্ছে! নিজের নাম নিজে ভুলে গেছেন এও কি সম্ভব? তবে আপনি যদি নিজের নাম-পরিচয় আমাকে জানাতে না চান, সে আলাদা কথা। আমিও সে সম্বন্ধে আপনাকে আর কোন কথা জিজ্ঞেস করতে চাই না। কিন্তু কেমন ভাবে আপনি কাপালিকের হাতে বন্দী হলেন, একথা বলতেও কি আপনার আপত্তি আছে?

—আপত্তি নেই। কিন্তু এখন আপনাকে বলতে পারবো না—পরে সময়মত বলবো।

আশ্চর্য! নিজেকে এমনভাবে গোপন করার কোন অর্থই আমি খুঁজে পেলাম না। ফাঁসির আসামী নয় যে পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেলে ফাঁসি যাবার ভয় আছে! ভদ্রঘরের মেয়ে—বিপাকে পড়ে পিশাচের হাতে বন্দী হয়েছে—নাম-পরিচয় জানাতে এত আপত্তি কিসের? তাছাড়া ঈশ্বরের অনুগ্রহে যদি এখান থেকে মুক্তি পাওয়া যায়···মুক্তিলাভের পর নিজের বাপ-মায়ের কাছে পৌঁছাতে হলে আমার সাহায্য ছাড়া যখন ওর কোন উপায়ই নেই, তখন আমার কাছে এত লুকোচুরি কেন? বন্দী হওয়ার ঘটনাটা জানাতেই বা এত আপত্তি কি বুঝছি না! আশ্চর্য! সত্যি বড় অদ্ভুত!

সহসা তীব্র হিসহিস শব্দে আমি চমকে উঠলাম। থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ও কিসের শব্দ?

—সাপের গর্জন!

—সাপ?

আবার চমকালাম।

—হ্যাঁ সাপ ; দেখবেন? আসুন আমার সঙ্গে—

—কিন্তু—

—ভয়ের কিছু নেই, আসুন—

অঞ্জনা বাঁ দিকে বেঁকে চলতে লাগলো, আমি চললাম তার পিছু পিছু।

সাপের গর্জন ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে।

অল্প পথ অগ্রসর হয়ে অঞ্জনা বললো, দাঁড়ান, আলোটা জ্বালুন একবার।

টর্চ জ্বেলে দেখলাম, হাত পাঁচ-ছয় তফাতে বিরাট এক গহ্বর! ওই গহ্বরের মধ্যে থেকেই সাপের গর্জন আসছে বুঝতে পারলাম।

আমাব কিছু বলবাব আগেই অঞ্জনা বললো, ওই গহ্বরের মধ্যে সাপ আছে। শুধু সাপই নয়, আবও এমন কিছু আছে, যা দেখে আপনি আশ্চর্য হবেন! আসুন দেখবেন। সাপে কামড়াবে না, ভয় নেই, অনেকটা নীচে সাপ আছে।

ভয় ও কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে গেলাম। তারপর গহ্বরের অভ্যন্তরে আলো ফেলে যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে বিস্ময় ও আতঙ্ক একই সঙ্গে আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

দেখলাম প্রায় দশ হাত নীচে অসংখ্য হীবা, মণি, মুক্তা, মোহর ইত্যাদি স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে রয়েছে, আর সেই রত্নস্তূপের ওপর পাঁচ-ছ'টা বিরাট অজগর সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে অবস্থান করছে। ওদের মধ্যেই দুটো সাপ একটু উঁচু দিকে মাথা তুলে ক্রমাগত হিসহিস শব্দ করে চলেছে!

অঞ্জনা বললো, কাপালিককে যদি নিধন করতে পারেন, তাহলে এই বিপুল ধন-সম্পত্তি অনায়াসেই আপনি লাভ করতে পারবেন। ভাল অস্ত্র হলে সাপগুলোকে মেরে ফেলা এমন কিছু কষ্টকর হবে না। আর এই ধন-রত্নের খবর একমাত্র ওই কাপালিক ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ জানে না। ওর দলের কোন লোকও জানে না।

তারপর একটু হেসে আবার বললো, আমার দিক থেকে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি আপনার কাজে বিন্দুমাত্রও বাধা দেবো না বা এই সম্পত্তির এক কণাও দাবি করবো না। আমি চাই শুধু মুক্তি !

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ সম্পত্তি কার, জানেন কিছু ?

—না, জানি না।

—আমার তো মনে হয়, এই প্রাসাদ যে রাজা তৈরি করেছিলেন তাঁরই !

—উঁহু, তাঁর নয়। এ প্রাসাদ তৈরী হওয়ার আগে থেকেই এই ধনরত্ন এখানে সঞ্চিত রয়েছে। কতদিন আগে কে বা কারা এই ধনরাশি এখানে রেখেছিল, তা আমার জানা নেই। তবে আমার ধারণা, পাঁচ-সাত শো বছর কিংবা তারও অনেক আগে কোন দস্যু-তস্করের দল এই সব ধনরত্ন লুণ্ঠন করে এনে এখানে জমা করতো। তারপর হয়তো কোনরকম দৈব-দুর্ঘটনায় কিংবা হয়তো নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া-বিবাদ করে তারা সকলেই মারা গেছে, এবং সেই থেকে এইসব ধনরত্ন এখানেই পড়ে রয়েছে। এরূপ কথা ভাববার কারণও অবশ্য আছে। বলছি শুনুন। আপনার মত সেই রাজারও

ছিল খুব শিকারের শখ। তিনি প্রায়ই দূর বনাঞ্চলে শিকারে বেরুতেন। একবার শিকারে বেরিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন এই গুহাটা। দলবল নিয়ে ভেতরে ঢুকে তিনি আশ্চর্য হয়ে যান গুহার বিশালতা দেখে। তখুনি তাঁর মনে গুহা-প্রাসাদ নির্মাণের অদ্ভুত কল্পনাটা জাগে। তারপর তিনি রাজধানীতে ফিরে গিয়ে কয়েকদিন পরেই নিজের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব, কয়েকজন মন্ত্রী এবং প্রায় একশো জন সুদক্ষ ভাস্করকে সঙ্গে নিয়ে আবার এই গুহা পরিদর্শনে আসেন। এই দ্বিতীয়বারে এসে তিনি গুহার মধ্যে কতকগুলো নরকঙ্কাল দেখতে পান। প্রথমবারে আলোর অভাবের জন্য সমস্ত গুহাটা পরিদর্শন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাছাড়া সঙ্গে তেমন লোকজন না থাকার জন্যও মনে তেমন উৎসাহ পাননি। তবু যেটুকু তিনি দেখেছিলেন, তাতেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এবার সঙ্গে এনেছিলেন প্রচুর আলো, প্রচুর লোকজন। একেবারে অভ্যন্তর প্রদেশের দিকে নরকঙ্কালগুলো পড়ে ছিল। প্রথম দিনে তিনি অতটা ভেতরে অগ্রসর হননি।

যাইহোক, তারপর একটা শুভদিন দেখে গুহা-প্রাসাদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে যায়। সে এক ইলাহী কাণ্ড! প্রাসাদ নির্মাণের সময়েই এই গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়। এই ধনরাশির ওপরেও দুটো নরকঙ্কালকে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। নরকঙ্কাল দেখে নানাজনে নানা কল্পনা করেছিল। রাজামশাই যে কল্পনা করেছিলেন, সেই কথাই আপনাকে জানিয়েছি। আমিও তাঁর কল্পনার সঙ্গে একমত।

অঞ্জনা থামলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু রাজামশাই এসব ধনরত্ন নিজের রাজধানীতে না নিয়ে গিয়ে এখানে এমনভাবে ফেলে রেখেছিলেন কেন?

অঞ্জনা বললো, রাজামশায়ের ধারণা ছিল, এই সম্পত্তি দস্যুদলের মৃত আত্মারা পাহারা দিচ্ছে। এ ধনরত্ন স্পর্শ করলে বা কোন উপায়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত করলে তাঁর সর্বনাশ হয়ে যাবে। কেবল কঙ্কাল দুটোকে তুলে ফেলে দিয়েছিলেন গুহার বাইরে। এখন এই সম্পত্তি কাপালিকেরাই বংশপরম্পরায় ভোগ করে আসছে। ভোগ অর্থাৎ নিজেদের খাওয়া-পরা এবং পূজা-অর্চনার জন্য যা সামান্য কিছু খরচ হয়, তাছাড়া অন্য কোন খরচ নেই।

আমি প্রশ্ন করলাম অঞ্জনাকে, আচ্ছা, আপনি চারশ বছর আগেকার এতসব খবর কেমন করে সংগ্রহ করলেন?

সে কথা নাই বা শুনলেন।—অঞ্জনা মৃদু হেসে বললো।

আমি ক্ষণকাল তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললাম, বেশ, আপনার অভিরুচি না হয় বলবেন না। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, এমন একটা অতুলনীয় প্রাসাদ কীভাবে রাজামশায়ের হাতছাড়া হয়ে গেল? তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্যের উত্তরাধিকারীদেরই তো এই প্রাসাদ ভোগ করবার কথা।

অঞ্জনা কী যেন একটু ভাবলো। ভেবে বললো, সময় খুব অল্প ······গুছিয়ে বলতে পারবো না। সংক্ষেপে বলছি শুনুন—আপনার মনের বহু প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে। সেই রাজবংশ এবং এই গুহারহস্যের মোটামুটি কাহিনী আপনাকে শুনিয়ে দিচ্ছি। আলো নিবিয়ে আসুন আমার পিছনে পিছনে—

॥ আট ॥

অঞ্জনা বলতে শুরু করলো, এ ঘটনা চারশো বছর আগেকার। যে রাজার কথা বলছি, তার ছিল দুই রানী, পাঁচ ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়েটিকে যে দেখতো, সেই তার রূপের প্রশংসা করতো। রাজ্যের প্রধান সেনাপতির স্বভাব খুব ভাল ছিল না। তাব মনে ইচ্ছা ছিল রাজকন্যাকে বিয়ে করবে। একদিন সে সাহসে ভর করে রাজাকে তাব ইচ্ছার কথা জানালো। বাজামশাই খুব রেগে গিয়ে তাকে যথেষ্ট তিবস্কার ও অপমান করলেন। কিন্তু অনুগ্রহবশতঃ চাকরি থেকে তাকে বরখাস্ত করলেন না। অপমানিত হয়ে সেনাপতিটিও খুব বেগে গেল এবং মনে মনে রাজামশায়ের সর্বনাশ করবার জন্য বদ্ধপরিকব হল। এরপর সে রাজামশায়ের সৈন্যদের মধ্যে কয়েকজনকে নিজের বশীভূত করে একটা দল তৈরি করতে লাগলো। এসব ব্যাপার ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারেননি। সেনাপতিটিও ছিল খুব চতুর ব্যক্তি। নিজের আচারে-ব্যবহারে সে তার মনের অসন্তোষ প্রকাশ হতে দেয়নি বিন্দুমাত্র। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে সে তার মনের হিংসাকে চরিতার্থ করে।

যখনকার কথা বলছি, সে সময় রাজামশাই সপরিবারে এই গুহাপ্রাসাদে বাস করছিলেন। তিনি যখন এখানে বাস করতেন বেশী সৈন্য-সামন্ত কাছে রাখতেন না। মাত্র পঁচিশ-ত্রিশজন সৈন্য প্রাসাদটাকে পাহারা দেবার জন্য থাকতো, আর থাকতো কয়েকজন দেহরক্ষী। এই সুযোগে সেনাপতি একদিন গুহা-প্রাসাদ আক্রমণ

করে বসলো। একমাত্র রাজকন্যাকে ছাড়া সেই পাষণ্ড রাজপরিবারের সকলকেই হত্যা করলো। যত সৈন্য-সামন্ত, নর্তক-নর্তকী, ঝি-চাকর ছিল কেউ প্রাণে বাঁচলো না। সেনাপতির মনের ইচ্ছা ছিল, রাজকন্যাকে নিয়ে অন্য কোন দেশে পালিয়ে যাবে, তারপর সেখানে গিয়ে তাকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করবে। রাজকন্যার কিন্তু একটুও ইচ্ছা ছিল না সেনাপতিকে বিয়ে করবার। তাই কেমনভাবে ওই পাষণ্ডের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, এই চিন্তা সে করতে লাগলো। উপায় খুঁজে পেল……গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলো সে। মনের ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়াতে সেনাপতি দলবল নিয়ে রাজধানীতে ফিরে গিয়ে 'সাধু' সেজে বসলো।

এরপর যে ঘটনা ঘটলো, তা অত্যন্ত বিচিত্র ঘটনা। রাজামশাই ছিলেন কালীমায়ের পরম ভক্ত। এই গুহার মধ্যে এখন যে প্রতিমা রয়েছে, ওই প্রতিমাই হল রাজামশায়ের প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা। চারশো বছর ধরে ওই প্রতিমা এই পাষাণপুরীর মধ্যে রয়েছে। প্রতিমাও পাথরের তৈরী। এক দুর্দান্ত কাপালিক ছিল ওই প্রতিমার পুরোহিত। রাজামশাই তাকে মাসিক বেতন দিতেন। কাপালিক প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় প্রাসাদে মায়ের পূজা করতে আসতো। সে থাকতো এখান থেকে বেশ খানিকটা তফাতে এক গুহার মধ্যে। সেই গুহাতে সে বাস করতো আর শব-সাধনা করতো। হত্যা-কাণ্ডের ব্যাপার সে কিছুই জানতে পারেনি—হত্যাকাণ্ড হয়েছিল সকালের দিকে। সেদিন সন্ধ্যায় পূজা করতে এসে সে দেখতে পেল সকলকার মৃতদেহ। রাজকন্যার ঝুলন্ত দেহটাও সে দেখলো। রাজকন্যার মৃতদেহ দেখে কাপালিকের মনে এক উদ্ভট খেয়াল

জাগলো। মৃতদেহটা নামিয়ে সম্মুখে রেখে নিজের মন্ত্রশক্তির প্রভাবে সে রাজকন্যার আত্মাকে আকর্ষণ করতে লাগলো। তার মনের ইচ্ছা, রাজকন্যার মৃতদেহের মধ্যে তার আত্মাকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করবে, এবং ফলে যে নূতন রাজকন্যা জন্ম নেবে, তাকে সে নিজের সহকারিণী হিসাবে গ্রহণ করবে। সে হবে কাপালিকের সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন! কাপালিকের প্রত্যেকটি আদেশ সে কলের পুতুলের মত পালন করবে!

এই পর্যন্ত বলে অঞ্জনা হঠাৎ চুপ করলো, এবং স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন শুনতে লাগলো। আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম তার কথা। কোন্ পথ থেকে কোন্ পথে চলেছিলাম কিছুই আমার খেয়াল ছিল না; কতটা পথ এসেছি, তাও অনুমান করতে পারছি না।

অঞ্জনা থামতে আমিও দাঁড়ালাম। ওর হাবভাব দেখে বুঝলাম, কিছু একটা ঘটেছে অথবা ঘটবে। কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই ও চাপাস্বরে আমাকে কথা বলতে নিষেধ করলো। তারপর বললো, কাপালিক বোধ হয় এইদিকেই আসছে—খুব সাবধান! তাড়াতাড়ি আসুন আমার সঙ্গে। ওদিকে একটা বড় ফাটল আছে—ওই ফাটলটার মধ্যে আপাততঃ লুকনো যাবে আসুন।

একটু অগ্রসর হতেই ডানপাশে ফাটলটা পড়লো। দুজনে সেই ফাটলের মধ্যে প্রবেশ করলাম। বেশ চওড়া ফাটল—দুজনে পাশাপাশি দাঁড়ানো যায়। ফাটলটা ভেতরের দিকে অনেকখানি চলে গেছে বলে মনে হয়।

আমাকে একটু ভেতরের দিকে ঠেলে দিয়ে অঞ্জনা ফাটলের

মুখের কাছে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখলো।

আমি তখনও পর্যন্ত কাপালিকের উপস্থিতি টের না পেয়ে অঞ্জনার কাছে সরে এসে জিজ্ঞেস করলাম, কাপালিক আসছে বুঝলেন কেমন করে ?

অঞ্জনা বললো, তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। শব্দ এইদিকেই এগিয়ে আসছে।

—কই আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না !

অঞ্জনা একটু হেসে বললো, আপনার শ্রবণশক্তি আর আমার শ্রবণশক্তির মধ্যে বহু পার্থক্য আছে ! এই গুহার বাইরে দিয়েও যদি কোন লোক হেঁটে যায়, সে শব্দও আমি শুনতে পাই ! কাপালিক বোধহয় সাপেদের খেতে দেবার জন্যে আসছে।

আমি জিজ্ঞেস কবলাম কোন্ সাপেদের ?

—যে সাপেদের দেখে এলেন। এগুলো হল কাপালিকের পোষা সাপ। রোজ তিনবার করে কাপালিক ওদের খেতে দেয়। রাত্রে তুবার, দিনে একবাব। তুপুরে, সন্ধ্যারাতে আর শেষ রাত্তে।

সাপগুলো কি সব সময় ঐ গর্তের মধ্যেই থাকে ?—আমি শুধালাম।

—বেশির ভাগ সময়ই ওখানে থাকে—ওটাই ওদের আস্তানা। কখনো-কখনো গুহা থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিকও ঘোরাঘুরি করে।

—আপনাদের ক্ষতি করে না ?

—না। আমাদের তুজনকে ওরা খুব ভালভাবেই চেনে—

আমাদের দেখলেই মাথা নীচু করে ওরা চলে যায়। আপনারও ভয়ের কিছু নেই—এমন আশ্রয় আপনাকে দেব, যেখানে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন।

এই পর্যন্ত বলে অঞ্জনা হঠাৎ ফাটলের মুখ থেকে সাঁত করে অনেকখানি ভেতরে চলে এলো এবং আমাকে বললো, সরে আস্থন এদিকে, কাপালিক আসছে!

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠলো। অঞ্জনাব কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম. দেখতে পেয়েছেন?

– হ্যাঁ, মশালের আলোব আভা দেখতে পেয়েছি। খুব সাবধানে থাকবেন, একটু শব্দ করবেন না! কাপালিকের কান খুব সজাগ—মাটিতে স্থঁচ পড়লেও শুনতে পায়! সে যদি আপনার উপস্থিতি কোনরকমে টের পায়, তাহলে বাঁচবার আশা আর থাকবে না!

মশালের আলো এবার আমার নজরেও পড়লো। ফাটলের বাইরে লালচে আভা জেগেছে। আমার মনে অদম্য কৌতূহল জাগলো কাপালিককে দেখবার জন্য। এতবড় একজন ক্ষমতা-সম্পন্ন পুরুষ···তাকে দেখতে কেমন? কী রকম তার চেহারা?

মশালের লাল আভা ক্রমশঃই উজ্জ্বল হচ্ছে······

উজ্জ্বল আলোয় ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গুহা-প্রাচীরের রেখাগুলো। আমার বুকের স্পন্দনও দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগলো।

অঞ্জনা অত্যন্ত নীচুগলায় আমাকে বললো, আরও ভেতর দিকে আস্থন। মশালের আলো গায়ে লাগলে কাপালিকের দৃষ্টি পড়তে পারে!

কথাটা সত্যি। আরও একটু ভেতরদিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। ফাটলের বাইরের দিকে আমার দৃষ্টি তীক্ষ্ণভাবে নিবদ্ধ হয়ে রইলো।

কিন্তু মনের আশা আমার মিটলো না। কাপালিক হাঁটছিল খুব তাড়াতাড়ি। জ্বলন্ত মশালটা মুহূর্তের জন্যে আমার চোখ দুটোকে ধাঁধিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল! যেটুকু সময় দেখলাম, শুধু মশালের আলোটাকেই যেন দেখলাম। মশালটা উঁচু করে ধরে ছিল কাপালিক। ফলে মশালের নীচেকার কম্পিত আলো-ছায়ার মধ্যে তার চেহারাটা নজরেই পডলো না আমার!

কিন্তু ওকে দেখবার জন্যে আমারও যেন রোখ চেপে গেল। আমি তাড়াতাড়ি ফাটলের মুখের কাছে এগিয়ে গেলাম। পায়ে ছিল রবার সোল দেওয়া বুট জুতো‥‥‥নিঃশব্দেই অগ্রসর হয়েছিলাম। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। বুটের আঘাতে ছোট্ট একটা পাথরের টুকরো ছিটকে গেল খানিকটা তফাতে। ঠক্-ঠকাস শব্দ হল। তবুও আমি মাথাটা ফাটল থেকে বাইরের দিকে একটু বের করে কাপালিককে দেখবার চেষ্টা করলাম। এক পলকের জন্যে দেখেই ভয়ে আঁতকে উঠে পালিয়ে এলাম ভেতরের দিকে। দেখলাম কাপালিক ঘুরে দাঁড়িয়েছে। উঃ! কী ভয়ানক মূর্তি! অবশ্য মূর্তিটার সব কিছু দেখবার সুযোগ পেলাম না‥‥‥শুধু দেখলাম, দাঁড়ি, গোঁফ আর জটায় ভরতি একটা বিরাট মাথা, আর বাঘের মত দুটো হিংস্র জ্বলন্ত চোখ!

অঞ্জনার পাশে গিয়ে আমি রীতিমত কাঁপতে লাগলাম। মনে হচ্ছে কাপালিক যেন আমাকে দেখতে পেয়েছে! যদি সত্যই সে দেখতে পেয়ে থাকে, তাহলে উপায়? রিভলভারে দুটো গুলি আছে

বটে, কিন্তু অঞ্জনা বলেছে কাপালিক সবসময় মন্ত্রশক্তিতে শক্তিমান্ হয়ে থাকে, তাব অনিষ্ট কবা সহজ নয়!

অঞ্জনা আমাকে কোন কথা জিজ্ঞেস না করে তাড়াতাড়ি ফাটলের মুখেব দিকে এগিয়ে গেল এবং পবক্ষণেই ফিরে এসে আমাকে বললো কাপালিক বুঝতে পেবেছে···এদিকে এগিয়ে আসছে! ছি ছি, কী সর্বনাশ কবলেন বলুন তো! আপনাকে এত সতর্ক কবে দিলাম, তবু সব পণ্ড কবে ফেললেন! আপনাকে বাঁচাবাব আব তো কোন উপায় দেখছিনে!

ভয়ে আমার সর্ব অঙ্গ ঘেমে উঠলো। ফাটলেব বাইবে মশালের আলোব আভা ক্রমশঃই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে! বুঝলাম কাপালিক এগিয়ে আসছে····.

অঞ্জনা বললো, আব ভাববাব সময় নেই······শুনুন, আপনি আরও ভেতর দিকে চলে যান···খানিকটা ভেতরে গেলেই দেখবেন ফাটল শেষ হয়ে গেছে···সেখানে চুপচাপ আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। আমি বাইরে যাচ্ছি···দেখি কাপালিকের মনের সন্দেহ দূর করতে পারি কিনা? যতক্ষণ—আমি না ফিরি, ততক্ষণ আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করবেন। যান ···আরও ভেতবে চলে যান··· ···আমি চললাম।

অঞ্জনা খুব দ্রুত বেরিয়ে গেল।

ও চলে যেতেই আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। কি করবো কিছুই ভাবতে পারছি না···আগেকার মতই আমার চিন্তাশক্তি লোপ পেয়ে গেল। ক্ষণকাল সেখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এক পা এক পা করে ভেতরের

দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। এমন বিপদের অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম সঞ্চয় করলাম। বিপদে বহুবার পড়েছি…শিকারে বেরিয়ে কতবার বাঘ-ভাল্লুকের সম্মুখে পড়েছিলাম…বাঁচবার আশা ছিল না। কিন্তু তবু এ বিপদের কাছে সে বিপদ যেন একেবারেই তুচ্ছ! এমন বিপদের মাঝে না পড়লে হয়তো কল্পনাও করতে পারতাম না যে এমন ভয়ংকর বিপদ ঘটতে পারে!

ছু-চার পা এগিয়ে বুঝলাম, ফাটলটা একটু ডানদিকে বেঁকেছে। পাশের দেওয়ালে হাত দিয়ে দিয়ে অন্ধের মত অগ্রসর হতে লাগলাম। চোখের সামনে অন্ধকার পটভূমিকায় কাপালিকের বীভৎস মুখখানা যেন ভাসছে! গোঁফ দাড়ি আর জটায় ভরা বিরাট একটা মাথা, আর ছুটো জ্বলন্ত চোখ…

ক্রমে ক্রমে আমার চিন্তাশক্তি আবার ফিরে আসতে লাগলো। কাপালিক কি আমাকে দেখেছে? যদি দেখতে পেয়ে থাকে, তাহলে তো সে এখুনি এসে পড়বে! অঞ্জনা কেমনভাবে তাকে বাধা দেবে? সে স্বচক্ষে যা দেখেছে, তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কি সম্ভব? অঞ্জনা অবশ্য তাকে আশা দিয়েই গেছে। কিন্তু সে-আশা নিছক স্তোকবাক্যও তো হতে পারে!

ভাবতে ভাবতে আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। এখান থেকে পালিয়ে যাবারও তো কোন উপায় নেই। একদিকে পথ বন্ধ, আর অপর দিকে কাপালিক!

ভাবছি আর সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

সহসা পিছন দিকে খুব চাপা হিসহিস শব্দ শুনে আমি চমকে উঠলাম। আগেকার শব্দ এখনও আমার কানে লেগে আছে! তড়িৎ

বেগে পিছন ফিরে দাঁড়ালাম। টর্চের বোতাম টিপলাম। দেখলাম, মাত্র চার-পাঁচ হাত তফাতে বিশাল একটা ময়াল সাপ ওপর থেকে নীচের দিকে মাথা রেখে ঝুলছে, আর হিসহিস গর্জন করছে! টর্চের আলো দেখে সাপটা এবার দুলতে শুরু করলো এবং তীব্রস্বরে ফুঁসতে লাগলো!

জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে আমি কোনদিন কর্তব্যবুদ্ধি হারাইনি। ডানহাতে রিভলভারটা শক্ত করে চেপে ধরে আমি এক পা এক পা করে পিছন দিকে হাঁটতে লাগলাম। বাঁ হাতে টর্চটা জ্বলছে। আমার চোখ দুটো স্থিরভাবে নিবদ্ধ হয়ে রইলো সাপটার মাথার দিকে। গুলি ছুঁড়ে এই মুহূর্তে ওটাকে হত্যা করতে পারি। কিন্তু তারও উপায় নেই! গুলির শব্দ পেলেই কাপালিক ছুটে আসবে!

কয়েক পা পিছু হেঁটেছি, এমন সময় সাপটা লাফিয়ে পড়লো নীচে, এবং আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে লাগলো আমার দিকে। আমি আরও তাড়াতাড়ি পিছু হাঁটতে লাগলাম।

কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণই বা কাটবে? আর কতদূরে ফাটলের শেষ, তা অবশ্য জানি না। তবে পথ যে ক্রমশঃই শেষ হয়ে আসছে, এ ভয়ংকর সত্য অস্বীকার করি কিরূপে?

আমার দেখাদেখি সাপটাও তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে লাগলো। বুঝতে পারলাম, শেষ পর্যন্ত গুলি ছুঁড়তেই হবে! গুলি না ছুড়ে এই সাক্ষাৎ যমের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না!

অঞ্জনাকে মনে পড়লো। সে যদি এ সময় কাছে থাকতো, তাহলে হয়তো বাঁচবার একটা উপায় সে বাতলে দিতে পারতো।

আমাকে বাঁচাবার জন্য তার আন্তরিক চেষ্টা আছে, এ সত্য আমি উপলব্ধি করেছি!

এই যাঃ! সর্বনাশ! পিঠে কঠিন পাথরের স্পর্শ অনুভব করলাম। পথ শেষ হয়ে গেছে! আমার সর্বশরীরের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল!

ময়াল এগিয়ে আসছে!

সাক্ষাৎ যম!

মাত্র আট ন'হাত তফাতে...

মুহূর্তের জন্যে একবার পিছন দিক্‌টা দেখে নিলাম। আর অগ্রসর হওয়ার উপায় নেই! গুলি ছুঁড়তেই হবে এবার!

আমি দাঁড়িয়ে পড়তেই সাপটা আবার মন্থরগতিতে এগিয়ে আসতে লাগলো। ও বোধ হয় বুঝতে পেরেছে যে, শিকার বন্দী হয়েছে। আমিও তার ছোট মাথাটা লক্ষ্য করে টর্চ আর রিভলভারটা স্থির করে ধরলাম। উত্তেজনায় আমার কপালে এবং ঠোঁটের ওপর বড় বড় ফোঁটায় ঘাম জমে উঠেছে!

সাপটা মাত্র আর হাত চারেক তফাতে। তার গতি আরও মন্থর হয়েছে। শিকারকে আক্রমণ করার পূর্বলক্ষণ আর কি! নাঃ, আর অপেক্ষা করা চলে না!

গুড়ুম!

অব্যর্থ লক্ষ্যে ময়ালের মাথাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল যেন প্রলয় কাণ্ড! অতবড় সাপটার সমস্ত দেহটা মুহূর্তে কুঁকড়ে গুটিয়ে এলো, এবং সেই সঙ্গে কী ভীষণ দাপাদাপি!

কিন্তু বেশীক্ষণ নয় ··মাত্র মিনিটখানেকের মধ্যেই নিস্তেজ হয়ে পড়লো।

সাপ তো মরলো, কিন্তু কাপালিক! কয়েকটা মুহূর্তের জন্য কাপালিকেব কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম; মনে পড়তেই বুকটা ছ্যাঁত কবে উঠলো। আমি এবার ভালভাবে লক্ষ্য করতে লাগলাম, এদিক্ দিয়ে পালাবাব কোন পথ আছে কিনা? পালাবার পথ না থাক, অন্ততঃ আত্মগোপন কববাব মত যদি কোন নির্ভবযোগ্য আশ্রয় পাওয়া যায় নাঃ, সে বকম কোন স্থান নেই! একেবাবে সবল ফাটল!

কি কবা যায়? এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবো না, এগিয়ে গিয়ে দেখবো কাপালিক আসছে কিনা? কি কববো? কি কবি?

ভাবতে ভাবতেই মুহূর্তেব পব মুহূর্ত অতিবাহিত হতে লাগলো।

সাপটা নিথব হয়ে গেছে—সাপের ভয় আব নেই। তাই টর্চ নিবিয়ে ভাবছিলাম এইসব কথা। সহসা মনে হল, চোখের সামনেকার জমাট অন্ধকাব যেন একটু ফিকে হয়ে এসেছে। যেন ঈষৎ লালচে আভা চোখে পড়ছে! তবে কি কাপালিক মশাল নিয়ে আসছে! অঞ্জনাও তো হতে পারে? না, অঞ্জনা মশাল নিয়ে আসবে না; সে এলে অন্ধকারেব মধ্যে দিয়ে অশরীরী প্রেতাত্মার মত নিঃসাড়ে আসবে!

আলোর আভা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

কাপালিক আসছে, তাতে আমার কোনই সন্দেহ রইলো না। পিস্তলটা বেশ শক্ত করে চেপে ধরলাম। মাত্র আর একটা গুলি আছে—ওই একটা গুলির ওপরেই আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জনার কথা মনে পড়লো। সে বলেছে, কাপালিক সবসময় নিজেব মন্ত্রশক্তিতে শক্তিমান্ হয়ে থাকে···তার অনিষ্ট করা যায় না!

তবে? তবে কি ব্যর্থ হয়ে যাবে আমার পিস্তলেব গুলি?

খুব তাড়াতাড়ি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে মশালের আলো। অপলক দৃষ্টিতে আমি চেয়ে বইলাম।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরেই কাপালিকের ভয়ংকর মূর্তিটা আমার চোখের সামনে জীবন্ত বিভীষিকার মত জেগে উঠলো।

আমাকে দেখেই সে থমকে দাঁড়ালো। চোখ দুটো তার চকচক কবে উঠলো···মুখে ফুটে উঠলো পৈশাচিক হাসির বেখা! খুব খুশী হয়ে উঠেছে সে। বিনা আয়াসে এমন হাতেব মুঠোব মধ্যে বলি পাওয়া ভাগ্যের কথা বইকি!

মুখে একটা অস্ফুট শব্দ করলো সে। তাবপর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলো আমার দিকে। আমিও যন্ত্রচালিতের মত তার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করে পিস্তলটা উঁচু করে তুলে ধরলাম। আর একটু কাছে এলেই গুলি ছুঁড়বো! তারপর বরাতে যা আছে, তা হবে!

ওব সমগ্র চেহারাটা এবার দেখবার সুযোগ পেলাম।

দীর্ঘ ঋজু বলিষ্ঠ চেহারা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে গাঢ় রক্তবর্ণের কাপড়। ঊর্ধ্ব অঙ্গে কোন পোশাক নেই। উভয় হাতের বাহুতেও রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় কাঁধ পর্যন্ত দীর্ঘ জটা আর রুক্ষ চুলের রাশ, বড় বড় দাড়ি-গোঁফে ঢাকা সমস্ত মুখখানা। কপালে লাল রঙের বড় একটা গোল ফোঁটা। সম্ভবতঃ তেল

সিঁদুরের কৌটা। বাঁ হাতে মশাল আব ডানহাতে চকচকে ধারালো ত্রিশূল।

আমার চোখের উপব চোখ বেখে সে এগিয়ে আসতে লাগলো।

দুজনের ব্যবধান যখন মাত্র হাত ছয়েক, সেই সময় আমি বিভলভাবেব ট্রিগাবটা টেনে দিলাম।

—গুড়ুম!

॥ নয় ॥

গুহাটা যেন আশ্চর্যেব খনি! পৃথিবীব আশ্চর্যতম ঘটনাগুলো এই গুহার মধ্যেই যেন জট পাকিয়ে আছে। একটার পর একটা বিস্ময়ের ধাক্কায় আমি ক্রমশঃই নিজের সত্তাকে হাবিয়ে ফেলছিলাম। অঞ্জনা বলেছিল, কাপালিককে নিধন কবা সহজ কথা নয়। আমি ভেবেছিলাম, বিপদেব হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার নানা অদ্ভুত উপায় তাব জানা আছে। কিন্তু সে উপায় যে এত ভয়ংকর বকমেব অদ্ভুত, এত অসাধারণ, এত অবিশ্বাস্য তা কে জানতো।

গুলি ছুঁড়তেই পিশাচটা হাঃ হাঃ করে বিশ্রী রকমের হেসে উঠলো, এবং আমার দিকে যেমন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল, ঠিক সেইভাবেই এগিয়ে আসতে লাগলো।

আমি দুচোখে অন্ধকার দেখলাম। ঠিক বুকের মাঝখানটা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিলাম। এত কাছ থেকে আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট

হতে পারে না—এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে। গুলিটা তবে গেল কোথায় ?

আমার হাত তিনেক তফাতে এসে কাপালিক দাঁড়ালো। তার দু চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে! সেই অগ্নি-ঝরা দৃষ্টিতে সে আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলো। আমি এবার মরিয়া হয়ে পিস্তলটাই ছুঁড়লাম তার কপাল লক্ষ্য করে। সে সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা একপাশে সরিয়ে নিল। সে এবার স্বাভাবিকভাবেই আমার আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে বাঁচালো। পিস্তলটা খানিকটা তফাতে পাথরের গায়ে লেগে ছিটকে পড়লো।

মৃদু হাওয়ায় শুকনো খড় যেমন শিরশির করে কাঁপে, আমার দেহটাও ঠিক তেমনিভাবে কাঁপতে লাগলো। আমি ইতিপূর্বে বহু দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছি, বহু আতঙ্কের সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু এমন আতঙ্ক কল্পনারও বাইরে ছিল।

আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল তীব্রদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে কাপালিক গম্ভীর কণ্ঠে বললো, আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে···আমার আগে আগে চলো···

একটু ইতস্ততঃ না করে, একটি কথাও না বলে আমি চলতে শুরু করলাম। পিশাচটা আমার পিছনে পিছনে আসতে লাগলো।

ফাটল থেকে বেরিয়ে বাইরে পা দিতেই সে হুকুম করলো, বাঁ দিকে চলো।

আমি তার হুকুমমত অগ্রসর হলাম।

এবং তার হুকুম মাফিক এ পথ থেকে সে পথ, সে পথ থেকে

আরেক পথে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত যে পথে এসে পৌঁছালাম, সে পথ দিয়ে আব কোথাও যাওয়া চলে না। পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে··· সম্মুখে সুকঠিন পাথরের দেওয়াল।

কাপালিক এগিয়ে গেল দেওয়ালটার নিকটে। মশালের আলোয় দেখতে পেলাম "দ"-এব আকারে বাঁধানো একটা মোটা লোহাব সিক দেওয়ালটাব একস্থানে বসানো রয়েছে। মশাল আব ত্রিশূল রেখে কাপালিক ত্বু হাতে সেই লোহার সিকটা ধরে সবলে ঘোরাতে লাগলো। ফলে আমার চোখের সামনে আর এক আশ্চর্য ব্যাপাব ঘটে গেল। দেওয়ালের বুক থেকে একটা গোলাকার অংশ ধীবে ধীবে নীচেব দিকে নেমে গিয়ে একটা গোল গহ্বরের সৃষ্টি হল। মনে হল, একটা গোলাকার সুড়ঙ্গপথ চলে গেছে। কতদূব গেছে, বাইরে থেকে তা অনুমান করা তুঃসাধ্য গহ্বরটার ব্যাস তিন ফুটের বেশী হবে না। এমন একটা বিচিত্র গহ্বব তৈবি কবাব পিছনে রাজামশায়েব বিশেষ কোন গোপনীয় উদ্দেশ্য ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই!

কাপালিক এবার আদেশ করলো, প্রবেশ কবো এই দ্বারের মধ্যে।

আমি ইতস্ততঃ করতে লাগলাম।

—যাও!

বাজ ডাকার মত হুংকার দিয়ে উঠলো সে।

সমস্ত গুহাটা গমগম করতে লাগলো।

আর সাহস পেলাম না দাঁড়িয়ে থাকতে। ভয়ে ভয়ে তার মুখের দিকে একবার চেয়ে মাথা নীচু করে সেই গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

ভেতরে গিয়ে বুঝলাম, বাইরে থেকে সুড়ঙ্গ মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু আসলে ওটা সুড়ঙ্গ নয়। মশালের আলোয় আবছাভাবে দেখতে পেলাম মাথাব ওপর অনেকটা উঁচুতে ছাদ, এবং ছুপাশেও প্রচুর জায়গা।

সহসা আমার চোখের সামনে নিবিড আঁধার নেমে এলো। পিছন ফিরে চেয়ে দেখলাম, গহ্বর-পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

টর্চ জ্বেলে এগিয়ে গেলাম বন্ধ দ্বাবের কাছে। নানাভাবে পরীক্ষা করেও দ্বার উন্মুক্ত করবার কোন উপায় খুঁজে পেলাম না। হতাশ হয়ে কপালের ঘাম মুছলাম। রিস্টওয়াচে তখন পাঁচটা।

অর্থাৎ গুহার বাইরে উষার আলো ফুটে উঠেছে।

বাইরের জগতেব কথা মনে পড়ে গেল। কী সুন্দর সুন্দর গাছপালা, বাড়ি-ঘর, নদী-নালা, সূর্যের আলো, নীল আকাশ, লোক-জন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-পরিজন···ওঃ, কতদিন যেন সেসব আমি দেখিনি···কতদিন যেন আমি মানুষের মুখ দেখিনি···কত যুগ-যুগান্ত ধরে যেন আমি একাকী বন্দী হয়ে আছি এখানে! কাপালিক? আর ওই রহস্যময়ী রমণী? গুহায় বন্দী হয়ে এই ছুজনকে আমি দেখেছি বটে, কিন্তু ওদের আমি মানুষের মধ্যে গণ্য করতে পারিনি! মেয়েটির সঙ্গে আমি অনেক কথা বলেছি, তার কাছ থেকে বন্ধুর মত ব্যবহার পেয়েছি···তবু···আশ্চর্য···ওর সঙ্গে যখন কথা বলেছি, মানুষের সঙ্গে কথা বলছি বলে ভাবতে পারিনি! ওকে যখন দেখেছি, মানুষকে দেখছি বলে ভাবতে পারিনি···ওকে দেখে মানুষ দেখার সাধ আমার মেটেনি!

সঙ্গীদের কথা মনে পড়লো। তারা এখন কোথায় আছে? কি করছে তারা? তারা কি তাঁবু গুটিয়ে দেশের পথে রওনা হয়ে গেছে? হয়তো তারা ভেবেছে ভূতের খপ্পরে পড়ে আমি প্রাণ হারিয়েছি! যা ভূতের ভয় ওদের!

সঙ্গীদের কথা ভাবতে ভাবতে আমার চোখে জল এসে গেল। এ জীবনে মানুষের মাঝে আমি কি আবার ফিরে যেতে পাববো? কাপালিকের হাতে যদি বন্দী না হতাম, তাহলে হয়তো···আমাকে বাঁচাবার জন্যে মেয়েটির আন্তরিক চেষ্টা ছিল···কিন্তু একমাত্র নিজের দোষেই আমি বন্দী হলাম। আর কতক্ষণই বা আমার পরমায়ু! আজ অমাবস্যা··আজ মধ্যরাত্রেই আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে! মেয়েটির পরামর্শমত যদি একটু সাবধান হয়ে থাকতাম, তাহলে হয়তো আমাকে এতটা বিপদের সম্মুখীন হতে হতো না।

সত্যি অঞ্জনার কাছে আমি যথেষ্ট ঋণী। অবশ্য আমাকে বাঁচাবার পিছনে যদিও ওর নিজের স্বার্থ রয়েছে—আমি মুক্তি পেলে সে-ও মুক্তি পাবে···তথাপি ওর ঋণ তো আমি অস্বীকার করতে পারি না! আমাকে বাঁচাবার জন্যে ও আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট। মুহূর্তের মধ্যে মনে মনে স্থির করে নিলাম, যদি আমি এখান থেকে মুক্তি পাই, তাহলে সর্বাগ্রে অঞ্জনার ঋণ শোধ করবার চেষ্টা করবো।

কিন্তু কে এই অঞ্জনা? ওর কোন পরিচয়ই তো পেলাম না! পরিচয় জিজ্ঞাসা করেও উত্তর পাইনি। নিজের কথা সে সম্পূর্ণরূপে গোপন করে গেছে আমার কাছে। এর কারণ কি? কেন সে

নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে রাজী নয়? তাছাড়া ওর হাবভাবে এবং কথাবার্তাতেও আমি বিশেষ আশ্চর্য হয়ে গেছি! আমার স্পষ্ট ধারণা, মেয়েটির জীবনে একটা বিরাট কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে!

স্বপ্ন যা দেখেছিলাম, অমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখারই বা অর্থ কি? অঞ্জনার মুখে গুহার যে ইতিহাস শুনেছি, চারশো বছর আগে এই গুহার রাজপরিবারের মধ্যে যে হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে, আজ চারশো বছর পরে অবিকল সেই ঘটনা স্বপ্নে দেখতে পেলাম কেন? আমি শুধু একা নই, আমার আগেও যারা নিয়তির টানে এই গুহার মধ্যে এসে পড়েছিল, তারাও নাকি ওই একই স্বপ্ন দেখেছে! এমন আশ্চর্য ব্যাপার পৃথিবীতে ঘটতে পারে বলে আমার জানা ছিল না···গল্পেও শুনিনি কোনদিন!

আরও বিচিত্র ব্যাপার, স্বপ্নের রাজকন্যার সঙ্গে এই মেয়েটির মুখের এমন হুবহু মিল দেখতে পেলাম কেন? এই প্রশ্নেরই বা মীমাংসা কি? মেয়েটিকে যদি ইতিপূর্বে আমার দেখা থাকতো, তাহলে হয়তো রাজকন্যারূপে ওকে স্বপ্নে দেখা অস্বাভাবিক হতো না। কিন্তু আগে আমি স্বপ্ন দেখেছি, তাবপর দেখেছি ওকে।

আমার কথা বাদ দিলেও এর আগে যারা এসেছিল, তারাও তো প্রত্যেকে ওই মেয়েটিকেই রাজকন্যারূপে স্বপ্নে দেখেছে!

আশ্চর্য স্বপ্ন!

স্বপ্ন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আশ্চর্যজনক হয়ে থাকে। কিন্তু এ হল অতি অদ্ভুত বিস্ময়কর স্বপ্ন! এ গুহার সব কিছুই বিস্ময়কর··· সব কিছুই রহস্যময়!

নাঃ, আর ভাবতে পারি না। ভাবতে গেলে মস্তিষ্ক গরম হয়ে ওঠে, ঘাম ঝরতে শুরু করে সর্বঅঙ্গ দিয়ে!

রুদ্ধদ্বারের কাছ থেকে সরে এসে অভ্যন্তরের দিকে টর্চের আলো ফেলে দেখলাম, সম্মুখের দিকে পথ চলে গেছে। অসমতল পথ। উভয় পার্শ্বের দেওয়াল, মাথার ওপরকার ছাদ—সবই অসমতল। এ জায়গা পাথব কেটে তৈরি করা হয়েছে না প্রাকৃতিক সৃষ্টি, বুঝতে পারলাম না।

এক পা এক পা করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। একেবারে নিঃসঙ্গ, নিঃসহায়, নিরস্ত্র আমি। সেই সাপটার মত আবার যদি কোন জন্তু-জানোয়াব আক্রমণ কবে বসে, আর আমি নিজেকে রক্ষা কবতে পাববো না।

চলতে চলতে হঠাৎ আমি একসময় দেখলাম, একটা বিরাট পাতালমুখী গহ্বরের ধারে এসে আমার পথ শেষ হয়ে গেছে। সারা পথটা জুড়ে হাঁ করে রয়েছে গহ্বরটা! আমাকে গ্রাস করবার জন্যেই বুঝি গহ্বরটা এখানে ওত পেতে রয়েছে!

টর্চের আলোয় দেখলাম, প্রায একতলা সমান নীচে কুচকুচে কালো জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে ঠিক নদীর মত। এখানে এত জল কোথা থেকে এলো? কোথা থেকে এ জল আসছে? কোথায়ই বা যাচ্ছে? ভাবতে লাগলাম এই সব কথা। যদি এই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি, তাহলে স্রোতের সঙ্গে ভেসে ভেসে আমি কি এই অভিশপ্ত গুহা থেকে বেরিয়ে যেতে পারবো? পাহাড়ের অভ্যন্তর প্রদেশে এমন অনেক গুপ্তনদী থাকে শুনেছি, যে নদী পাহাড়ের কোন ফাটল দিয়ে বেরিয়ে মাটির পৃথিবীতে নেমে

গেছে। এ নদীও নিশ্চয় সেই রকম কোন নদী···নইলে স্রোত আসবে কেন ?

ভাবতে লাগলাম, এখানে থাকলে কাপালিকের হাতে তো প্রাণ দিতেই হবে। তার চেয়ে নদী-গর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়াই ভাল। কোনরকমে মুক্তি যদি পেয়ে যাই, সে তো পরম সৌভাগ্য! মুক্তি না পেলেও কাপালিকের হাতে মৃত্যুর চেয়ে জলে ডুবে মরা অনেক ভাল !

গহ্বরের ধারে বসে বসে অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম, কী করবো, কী করি ?

সেই বিচিত্র রোমাঞ্চকর অবস্থার কথা মনে পড়লে এখনও আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! এদিকেও মৃত্যু, ওদিকেও মৃত্যু! দুই ভয়াবহ মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আমি দাঁড়িয়ে আছি প্রাণটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে !

শেষ পর্যন্ত জলে ঝাঁপ দেওয়াই কর্তব্য স্থির করলাম। তবু একটু বাঁচবার চেষ্টা করা যাবে। লক্ষ্য করে দেখেছি সাঁতার দিতে অসুবিধা হবে না। কারণ নীচের দিকটা বেশ ফাঁপা। ওপর থেকে প্রায় হাত চারেক মোটা পাথরের স্তর নীচের দিকে নেমে গেছে···তার পর থেকে নদী-পৃষ্ঠ পর্যন্ত একেবারেই ফাঁপা। অবশ্য নদী যতদূর গেছে, ততদূর পর্যন্ত ওইরকম ফাঁপা জায়গা পাওয়া যাবে কিনা, সে বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ জেগেছিল। কিন্তু অত সব ভাবতে গেলে আর ঝাঁপ দেওয়া চলে না।

গায়ের জামাটা খুলে টর্চটাকে ভাল করে জড়িয়ে নিলাম! এই অন্ধকারের রাজত্বে যতক্ষণ আমি বেঁচে থাকবো বা যতক্ষণ আমাকে



গুলি ছুঁড়তেই পিশাচটা হাঃ হাঃ করে বিশ্রী রকমের হেসে উঠলো,...

অবস্থান করতে হবে, টর্চটা অত্যন্ত উপকারে লাগবে। নদী-পথ কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে বেঁকেছে, বা নদীতে কোন বিপদ-আপদ আছে কিনা—সে সব জানা যাবে টর্চটা কাছে থাকলে। স্থির করলাম, জলে ঝাঁপ দেবার সময় টর্চটা এক হাতে উচু করে ধরে ঝাঁপ দেব, তারপর দাঁতে চেপে ধরে সাঁতার কাটবো। ঝাঁপ দিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতটা ডুবে গেলেও জামা দিয়ে জড়িয়ে রাখার জন্য টর্চটা ভিজবার সুযোগ পাবে না।

ঝাঁপ দেবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

দেহটা যেন একটু কেঁপে উঠলো আমার! বেশ ভয় ভয় করতে লাগলো! নাঃ, ভয় পেলে চলবে না। এই সঙ্গীন মুহূর্তে যদি ভয়ে কাতর হয়ে পড়ি, তাহলে সবই পণ্ড হয়ে যাবে। নিজের মনকে ধিক্কার দিলাম,—ছি, ছি, ভীরু তুমি!

তারপর······

তার পরই লাফ দিলাম।

—ঝপ্ পাং······

।। দশ ।।

জলের ওপর আমার দেহ-পতনের শব্দে সমগ্র পাতালরাজ্যটা যেন গমগম করে উঠলো! তোলপাড় হয়ে গেল শান্ত নদীর জল।

ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত দেহটা জলের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। তারপর ভেসে উঠে জামার মধ্যে থেকে টর্চটা

বের করে দাঁতে চেপে ধরলাম এবং জামাটা গুঁজে নিলাম কোমরে। এবার টর্চের সুইচ্ 'অন্' করে দিলাম। সোজা আলো চলে গেল। ব্যাটারির অবস্থা ভাল নয়, আলোর আভা লালচে হয়ে এসেছে। যতদূর নজরে পড়লো দেখলাম ওইরকম ফাঁপা জায়গা আর কালো জল······

ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে জলের বুকে যে ঢেউ জেগেছে, সেই ঢেউয়ের মাথাগুলো গলিত রুপোর মত চিকচিক করছে আলো লেগে। কালো মেঘের বুকে যেন বিজলীর রেখা!

এবার বাঁ দিকে মুখ ফিরালাম। নজরে পড়লো খাড়া পাহাড় বরাবর চলে গেছে। একটি দাঁড়াবার মত জায়গা নেই কোথাও। তারপর ডানদিকে আলো ফেলে যা দেখতে পেলাম, তাতে বেশ একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। এদিকেও খাড়া পাহাড় বরাবর চলে গেছে বটে, কিন্তু ওই খাড়া পাহাড়েরই এক অংশে রয়েছে একটা বড় সুড়ঙ্গ। নদীপৃষ্ঠ থেকে মাত্র এক বিঘত ওপরে ওই সুড়ঙ্গ। ডানদিকে বেঁকে সাঁতার কাটতে শুরু করলাম। বেশ চওড়া নদী। আমার কাছ থেকে ওই সুড়ঙ্গ প্রায় বিশ হাত তফাতে।

দু-চার হাত অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় 'ঝপ্' করে জলের ওপর কিছু একটা পড়ার শব্দ হল। মুখ থেকে টর্চটা হাতে নিয়ে পিছন দিকে ঘুরলাম। যা দেখলাম, তাতে আমার দেহের রক্ত হিম হয়ে গেল।

একটা অদ্ভুত রকমের জীবকে দেখলাম। খুবই অদ্ভুত। অনেকটা মাকড়সার মত দেখতে। আকারে মাকড়সার চেয়ে বহু বড়। কিন্তু মাকড়সার মত পাতলা গড়ন নয়—বেশ গোলগাল মোটাসোটা।

হাত-পা বাদ দিয়ে শুধু তাব দেহটাই সুবিরাট একটা কচ্ছপের মত! হাত-পা সমেত তার সমগ্র দেহটা লম্বা লম্বা ধূসর রঙের লোমে আচ্ছন্ন। কতগুলো হাত-পা আছে ঠিক বুঝতে পারলাম না। আট-দশটা হবে বোধ হয়। এবং সেগুলো লম্বায় প্রায় আড়াই হাত তিন হাত হবে! মুখ, নাক কিছুই দেখতে পেলাম না—শুধু লোমের ভেতর দুটো বড় বড নীল চোখ জ্বলতে দেখলাম।

প্রাণীটা বোধ হয় ওপরে কোন গর্তে ছিল—ঝাঁপিয়ে পড়েছে জলে। এবং আমাকে দেখেই যে সে ঝাঁপ দিয়েছে, এই ভয়ংকর সত্যটাও সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলাম। দেখলাম ঝাঁপ দিয়ে নদীতে পড়েই প্রাণীটা সাঁতাব কেটে আমাব দিকে খুব দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগলো।

প্রাণীটা আমাব কাছ থেকে তখন সাত-আট হাত তফাতে। বেশ বুঝতে পারলাম, জলপথে আমার যা গতি তার চেয়ে ওর গতি বেশী দ্রুত।

কাজেই আর মুহূর্তেক ভাববাব সময় নেই। এখনও আমাকে প্রায় পনেরো হাত পথ সাঁতার দিতে হবে। টর্চটা দাঁতে চেপে ধরে আমি প্রাণপণে সাঁতার কাটতে লাগলাম। মাত্র পনেরো হাত পথ যেন পনেরো যুগেব পথ বলে মনে হল আমার কাছে!

সম্পূর্ণ নিরস্ত্র আমি। তবু জল থেকে যদি ডাঙ্গায় উঠবার অবসর পাই, তাহলে হয়তো কোন রকমে জীবটার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার উপায় উদ্ভাবন করতে পারবো। যদিও আমার এ আশা সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার আশা ছাড়া কিছু নয়, তথাপি এ কথা

সত্য যে, জলের চেয়ে স্থল অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য! জলে আক্রান্ত হলে মৃত্যু অনিবার্য।

অর্ধেক পথ অগ্রসর হয়ে আর-একবার পিছন ফিরে তাকালাম। মাত্র আর হাত পাঁচেকের ব্যবধান! প্রাণীটার বাহুগুলো জলের ওপর দাঁড়টানার মত দ্রুত নড়ছে। কিছুমাত্র শব্দ নেই……নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে……

অদ্ভুত জীব! এমন জীবের কথা কোথাও শুনিনি, কোন বইতেও পড়িনি। তবে মাকড়সার সগোত্র বলে মনে হল।

রহস্যময় হিমালয়!

কত যে রহস্য এই পর্বতের আড়ালে লুকিয়ে আছে, কত যে অজানা জীব-জগতের লীলাক্ষেত্র এই হিমালয়, তার সঠিক হিসাব আজ পর্যন্ত কোন মানুষ সংগ্রহ করতে পারেনি।

যাই হোক প্রাণীটা আমাকে আক্রমণ করবার আগেই আমি সুড়ঙ্গের কাছে পৌঁছে গেলাম। তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে অভ্যন্তরের দিকে টর্চের আলো ফেলে দেখলাম কিছুটা সোজা গিয়ে সুড়ঙ্গটা বেঁকে গেছে বাঁ দিকে।

আমি মুহূর্তের জন্য পিছনের দিকে একবার তাকালাম। দেখলাম, জীবটাও পাড়ের ওপর উঠবার চেষ্টা করছে। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম সুড়ঙ্গের ওপর উঠে ও আমার পিছু ধাওয়া করবে। আর দাঁড়ালাম না—খুব দ্রুত পা চালিয়ে দিলাম সামনের দিকে।

কয়েক পা অগ্রসর হয়ে দেখলাম, আমার বাঁ পাশ দিয়ে আর একটা সুড়ঙ্গ চলে গেছে! ওই পথে না গিয়ে আমি সোজাই এগিয়ে চললাম। বাঁকের কাছে পৌঁছে আর একবার পিছনের

দিকে তাকালাম। যা ভেবেছিলাম তাই! প্রাণীটা সুড়ঙ্গের ওপর উঠে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

এবার আমি ছুটতে শুরু করলাম।

ঠিক এমন সময় পিছনের নদীতে একটা ভারী জিনিস পতনের শব্দ আমার কানে এলো। জিনিসটা কি তা দেখবার সুযোগ বা সময় আর নেই। সুযোগ নেই এই কারণে যে, আমি তখন অনেকটা বেঁকে গেছি—সেখান থেকে নদী চোখে পড়বে না। খানিকটা পিছিয়ে বাঁকের মুখে গিয়ে নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করবো, সে-সময়ও পাওয়া যাবে না! কারণ প্রাণীটা দ্রুত এগিয়ে আসছে!

কাজেই যেমন ছুটছিলাম, তেমনই ছুটে চললাম।

সর্বনাশ!

সামনের দিকে সোজাসুজি আলো ফেলতেই আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হল! দেখলাম আর পথ নেই! সাপের খপ্পরে পড়ে আমার যরকম অবস্থা হয়েছিল, এবারও আমাকে ঠিক সেই রকম অবস্থার মধ্যে পড়তে হল। মাত্র কয়েক গজ তফাতেই গুহা-পথ রুদ্ধ করে সুকঠিন পাষাণ-প্রাচীর দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার সর্বাঙ্গের মধ্যে দিয়ে যেন মৃত্যুর হিম-শীতল প্রবাহ বয়ে গেল! কেমন করে নিজেকে বাঁচাব এই ভয়ংকর প্রাণীটার হাত থেকে?

ছুটতে ছুটতে সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলাম।

জীবটাকে দেখতে পেলাম না। অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে—বাঁকের ওদিকে আছে বুঝলাম। সামান্য একটু অবসর। চতুর্দিকে দ্রুত দৃষ্টিপাত করলাম—কিন্তু আত্মগোপন করবার মত কোন আশ্রয়

খুঁজে পেলাম না। একেবারে হতাশ হয়ে পড়লাম—প্রাণের আশা ছেড়ে দিলাম।

মুহূর্তকয়েক পরেই প্রাণীটাকে দেখতে পেলাম। এগিয়ে আসছে আমার দিকে। কেমন করে আত্মরক্ষা করবো? নিজেকে বাঁচাবার চিন্তায় পাগলের মত হয়ে গেলাম।

পাশে বড় একটা পাথরের টকরো পড়ে রয়েছে। আন্দাজে মনে হল প্রায় পাঁচ-ছ মন ওজন হবে পাথরটার। অত ভারী জিনিস তুলবার ক্ষমতা আমার নেই। যদি ছোট হতো, তাহলে ওই পাথরের আঘাতে হয়তো প্রাণীটাকে হত্যা করতে পারতাম। তবুও এগিয়ে গিয়ে পাথরটা তুলবাব চেষ্টা করলাম। তোলা তো দূরেব কথা, এত ভাবী যে পাথরটা একটু নডাতেই পারলাম না!

আবার তাকালাম সামনের দিকে।

ওঃ, অনেক কাছে এসে গেছে প্রাণীটা। কী ভয়ংকর দেখতে ওটাকে! ঠিক মৃত্যুর মতই ভয়ংকর! নাঃ বাঁচবার কোন আশাই আর নেই! পাষাণের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সুনিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলাম!

ভয়ে আমার সারা দেহ প্রায় অসাড় হয়ে গিয়েছিল। হাতে অস্ত্র থাকলে এ ধরনের বিপদকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি। বরাবর তাই করে এসেছি! এবং নিরস্ত্র অবস্থাতেও যদি নিজেকে বাঁচাবার বিন্দুমাত্র উপায় আমার চোখে পড়ে, তাহলেও এধরনের বিপদে আমি বিচলিত হই না। কিন্তু তখন আমার এমন অবস্থা না আছে হাতে একটা অস্ত্র, না আছে মুক্তিলাভের এতটুকু পথ! এমন অসহায়ের মত

পৈতৃক প্রাণটাকে বিসর্জন দেওয়া বড় বড় বীরের পক্ষেও আপত্তিজনক হবে নিঃসন্দেহে !

প্রাণীটা আমার নিকটবর্তী হয়ে খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলো। শিকারের সম্মুখীন হয়ে শিকারী বোধ হয় একটু ভয় পেয়ে গেছে এমনি ভাব !

আমার চোখের সামনেটাও যেন ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে আসছে ! আগত মৃত্যুর চির-আঁধারের রেশ দেখতে পাচ্ছি বোধ হয় ! এই আবছা আঁধারের মধ্যে একমাত্র প্রাণীটার নীল চোখ দুটোই ঝকমকিয়ে জ্বলছে !

আমার মনের যখন এমন নিষ্ক্রিয় অবস্থা, সেইসময় সহসা আশ্চর্যজনক ভাবে আমার মগজে এক ফন্দি জাগলো। সারা দেহের মধ্যে যেন বিপুল শক্তি অনুভব করলাম। খুব দ্রুত ভাবতে লাগলাম, প্রাণীটা কাছে এলে যদি একটা লম্বা লাফ দিয়ে ওর দেহটাকে ডিঙিয়ে ওদিকে যেতে পারি, তাহলে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আবার খানিকক্ষণ চেষ্টা করবার সুযোগ পাব !

কিন্তু—

সমগ্র গুহাপথটা জুড়ে প্রাণীটা এগিয়ে আসছে। লাফ দিতে গিয়ে যদি ওর দেহে পা পড়ে ? তাহলে নিশ্চয় ও চাবুকের মত লম্বা লম্বা বাহুগুলো দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরবে ! তখন—?

নাঃ এসব বাজে কথা ভাববার কোন অর্থ হয় না। এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে তো মরতেই হবে ! তার চেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করতে গিয়ে মরা অনেক ভাল !

লাফ দেবার জন্য আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালাম। কাছে এলেই লাফ দেব। এখনও প্রায় হাত আটেক তফাতে রয়েছে……

।। এগারো ।।

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছি প্রাণীটার দিকে…চোখের পলক পড়ছে না আমার। সহসা সামনের দিকে দ্রুত পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে আমি চমকে উঠে সেদিকে তাকালাম। দেখলাম সেই রহস্যময়ী মেয়েটি ভিজা পোশাকে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। ওকে দেখেই আমার কণ্ঠ দিয়ে একটা তীব্র আর্তস্বর বেরুলো, আমাকে বাঁচান!

অঞ্জনার কাছ থেকে জবাব এলো, ভয় পাবেন না, যাচ্ছি!

দেখলাম প্রাণীটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অঞ্জনার পদশব্দ আর আমার আকস্মিক চিৎকারে ওটা বেশ হতচকিত হয়ে পড়েছে বুঝতে পারলাম।

প্রাণীটার কাছাকাছি এসেই অঞ্জনা এমন এক বিরাট লাফ দিল, এক লাফেই সে অত বড় দেহটা ডিঙিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। একজন নারীকে অতবড় লাফ দিতে দেখে আমি অত্যন্ত অবাক্ হয়ে গেলাম—মেয়েটা যেন শূন্যের ওপর দিয়ে উড়ে এলো।

আরও অধিক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। পাশের

সেই বিরাট ভারী পাথরটা অক্লেশে দু হাতে উঁচু করে তুলে নিল সে, তারপর প্রাণীটার দেহ লক্ষ্য করে সেটা ছুঁড়ে দিল।

প্রাণীটার সমস্ত দেহটা একেবারে থেঁতলে গেল, এক মুহূর্তের জন্যে তার সমস্ত বাহুগুলো একবার বিপুলভাবে আস্ফালন করে কুঁকড়ে নিথর হয়ে গেল!

আমি যেন স্বপ্ন দেখছিলাম। স্বপ্ন ভঙ্গ হল প্রাণীটার মৃত্যু হওয়ার পর। আমি বিস্ফারিত চোখে চাইলাম অঞ্জনার দিকে। দেখলাম অঞ্জনা আমারই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে···তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল,—কী অদ্ভুত শক্তি আপনার! অত ভারী পাথরটা কেমন করে তুললেন আপনি? কোন মানুষের পক্ষেই অত ভারী একটা জিনিস তোলা সম্ভব বলে আমি মনে করি না।

অঞ্জনা তেমনি ভাবেই আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো—কথার কোন জবাব দিল না।

আমি এবার অধৈর্য হয়ে বললাম, কথা বলছেন না কেন? আমার কথার জবাব দিন দয়া করে। অত ভারী পাথরটা কেমন করে তুললেন? আমিও তুলবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু একচুল নড়াতে পর্যন্ত পারিনি!

অঞ্জনা সহসা যেন খুব ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো, এখানে আর এক মুহূর্তও দাঁড়ানো নিরাপদ নয়! কাপালিক যদি হঠাৎ এসে পড়ে······এই দেওয়ালের গায়ে একটা গুপ্ত দরজা আছে······ এই পথ দিয়ে সে প্রায়ই নদীতে আসে। তাড়াতাড়ি আসুন

আমার সঙ্গে···একটা নিরাপদ জায়গায় আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

দুজনে অগ্রসর হলাম।

মৃত প্রাণীটাকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পার হয়ে গেলাম। জায়গাটা রক্তে ভেসে গেছে। অঞ্জনা বললো, এদিকেও গুহা থেকে বাইরে বেরুবার একটা পথ আছে। সেই পথ দিয়ে মাঝে মাঝে বন্য জন্তুরা এখানে ঢুকে পড়ে। কিন্তু নিজেরা আর বেরুতে পারে না—কাপালিকের নজরে পড়লে তাদের বেব করে দেয়। এই জন্তুটাও ওইভাবে ভেতরে ঢুকে আটকা পড়ে গিয়েছিল নিশ্চয়। আরও হিংস্র জন্তু-জানোয়ার থাকা বিচিত্র নয়।

চলতে চলতে কথা হচ্ছিল। এতক্ষণে আমি অনুভব করলাম যে আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। পিপাসাও পেয়েছে খুব। অঞ্জনার কাছে জানতে চাইলাম, ওই নদীর জল পান করা চলে কিনা? সে জানালো, ওই নদীর জলই তারা পান করে থাকে। অত্যন্ত সুস্বাদু জল। তারপর একটু হেসে সে বললো পিপাসা তো পেয়েছে, খিদে পায়নি?

আমি বললাম, পায়নি আবার! কিন্তু এখানে খাবার পাই কোথায়? আমার সব সময়েই বেশ খেয়াল আছে যে এটা শত্রুপুরী! আমার নিজের বাড়ি তো নয় এটা!

অঞ্জনা বললো, আমিও কি আপনার শত্রু? নানা উত্তেজনায় আমার একেবারেই খেয়াল ছিল না—খেয়াল থাকলে আপনাকে খেতে দিতে পারতাম। আচ্ছা আগে আপনার থাকবার জায়গাটা দেখিয়ে দিই, তারপর জল আর খাবার এনে দিচ্ছি।

আমবা নদীব দিকেই এগিয়ে চলেছি।

নদীর প্রায় কাছাকাছি এসে ডানদিকে যে সুড়ঙ্গটা গেছে, সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে অঞ্জনা প্রবেশ কবলো। আমিও তাকে অনুসবণ কবে চলতে লাগলাম।

কী বিশ্রী অন্ধকাব!

হাতেব ঘড়িব দিকে চেয়ে দেখলাম, ছটা বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে। অঞ্জনাকে জিজ্ঞেস কবলাম, সমস্ত গুহাবাজ্যটাই কি বাতে-দিনে এমন অন্ধকাব থাকে?

অঞ্জনা বললো, না। আমবা যে দিক্‌টায় থাকি, অর্থাৎ রাজামশাই বাস কবতেন যে অঞ্চলটায, ওদিকে মাথাব ওপর অসংখ্য ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রপথে সূর্যেব আলো ভেতবে প্রবেশ কবে। প্রাসাদ তৈবি কববাব সময় বাজামশায়েব হুকুমেই ওই ছিদ্রগুলো কবা হয়েছিল। কিন্তু সর্বত্র ওইবকম ব্যবস্থা কবা হয়নি এই কাবণে যে, ছিদ্র করা সম্ভব হয়নি সব জায়গায এখানে এমন অন্ধকাব থাকলেও আপনাকে যে জায়গায় পৌছে দেব, সেখানে আলো আর বাতাস দুই-ই পাবেন।

অন্ধকাবেব মধ্যে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি। আলো-হাওয়ার নাম শুনে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। বললাম, আশ্চর্য সৃষ্টি বটে। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যে সব আশ্চর্য জিনিসের সৃষ্টি হয়েছে, তাদেব মধ্যে এই গুহাপ্রাসাদটি সগৌরবে স্থান পেতে পারে!······আচ্ছা, আমার সেই প্রশ্নেব এখনও তো কোন জবাব দিলেন না? আপনাব অদ্ভুত শক্তির কথাই আমি জানতে চাইছি।

অঞ্জনা বললো, আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে অনেকটা সময় লাগবে। অতটা সময় এখন পাওয়া যাবে না। বুঝতেই তো পারছেন, সব সময়েই প্রাণে ভয়—এখন কি গল্প করা চলে? কাপালিককে শেষ করে মুক্তিলাভ করুন……তারপর আপনার সব কথার জবাব দেব। এই যে এসে গেছি আমরা। এখানে আছে একটি চোরা গহ্বর……রাজামশায়ের সৃষ্টি নয়, প্রাকৃতিক সৃষ্টি। গহ্বরটা বেশ নিরাপদ এবং ভেতরে থেকেও আরাম পাবেন।

—আরাম!

আমার মুখ দিয়ে কথাটা সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে আসে।

—হ্যাঁ, তা আরাম বইকি! এমন জায়গায় সূর্যের আলো, বাতাস আরামপ্রদ নয় কি! ভেতরে গিয়ে দেখতে পাবেন, মাথার ওপরে অনেকটা উঁচুতে কয়েকটা বড় বড় ফাটল আর গর্ত আছে, সেই পথ দিয়ে আলো-হাওয়া আসে। এখন সবেমাত্র সকাল হয়েছে .. ..মাঝরাত পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে থাকার চেয়ে আলো-হাওয়ার মধ্যে থাকা আরাম বইকি!.... . এপাশে আসুন।

ইংরেজী ভি (V)-এর মত খাঁজ বিশিষ্ট একটা জায়গা। এদিকের খাঁজ থেকে ওদিকের খাঁজে যেতেই বুক সমান উঁচুতে একটা ছোট গর্ত দেখতে পেলাম। অঞ্জনা বললো, এটাই হল চোরা গহ্বর। এই গর্তটার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। ভেতরে প্রচুর জায়গা আছে।

ছোট গর্ত। এক সঙ্গে একজনের বেশী যাওয়া-আসা করা চলে

না। গর্তটার ঠিক নীচেই একটা বড় পাথরের টুকরো পড়ে রয়েছে। ওই পাথরটার ওপর পা দিয়ে অঞ্জনা মাথা নীচু করে গর্তের মুখে উঠে বসলো, তারপর লাফ দিয়ে নেমে গেল ওদিকে। আমিও ঠিক ওই ভাবেই গহ্বরের ভেতর প্রবেশ করলাম। কিন্তু অন্ধকারের তারতম্য কিছু বুঝলাম না···একই রকম অন্ধকার মনে হতে লাগলো। জিজ্ঞেস করলাম অঞ্জনাকে, আপনি যে বললেন আলো-হাওয়া পাওয়া যাবে এখানে···

—আর একটু ভেতরের দিকে আসুন।

টর্চের আলোয় দেখলাম, জায়গাটা খুব সরু গলিপথের মত। বোধ হয় হাত তিনেক চওড়া হবে। আর লম্বার দিকে চেয়ে দেখি, মাত্র সাত-আট হাত তফাতেই পথ শেষ হয়ে গেছে। তবে এইটুকু সংকীর্ণ অংশই কি আমার থাকবার জায়গা? একথা অঞ্জনাকে জিজ্ঞেস করতে সে বললো, না, ওখানে পথের শেষ হয়নি... পথটা ওখানে ডান দিকে বেঁকে গেছে, তাই ওরকম মনে হচ্ছে। আসুন আমার সঙ্গে।

অত্যন্ত এবড়োখেবড়ো পথ—চলতে বেশ অসুবিধা হয়।

ডানদিকে বেঁকে মাত্র দু-চার পা গিয়ে আবার বেঁকতে হল। এবার বাঁ দিকে। তারপর প্রায় টানা বিশ হাত এগিয়ে আবার বাঁ দিকে বেঁকলাম। বেঁকতেই চোখের সামনেকার নিবিড় অন্ধকার ফিকে হয়ে এলো। গায়েও বেশ হাওয়ার স্পর্শ অনুভব করলাম। অনেকটা দূর অবধি দৃষ্টি চলছে। দেখলাম, পথ ক্রমশঃ চওড়া হতে হতে খুব অল্প দূরের মধ্যেই প্রায় পনেরো হাত চওড়া হয়ে গেছে। ওই চওড়া অংশে পৌঁছে দেখলাম, জায়গাটা বেশ আলোকিত।

মাথার ওপর প্রায় বিশ হাত উঁচুতে চার-পাঁচটা বড় বড় গহ্বর...সেই গহ্বর-পথ দিয়ে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে।

মেয়েটি থামলো। থেমে বললো, আর অগ্রসর হওয়ার দরকার নেই, এখানেই আপনি অপেক্ষা করবেন। দুপুরের দিকে রোদ আসবে, তখন আপনার আরও ভাল লাগবে। আচ্ছা, আপনি এখানে বসুন, আমি খাবার আর জল নিয়ে আসি। শুয়েও পড়তে পারেন, জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে দিই বিছানা তো নেই যে পেতে দেব।

আমি একটু হাসলাম। মরণের দ্বারে যে দাঁড়িয়ে, তার সুখের জন্য আবার এত চিন্তা!

নিজের কাপড় দিয়ে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে দিয়ে অঞ্জনা বললো, ইস্! আপনার তো একটা কাপড়ের দরকার। ভিজে জামা-কাপড়ে এতক্ষণ রয়েছেন. .শরীর খারাপ না হয় আবার! একটু অপেক্ষা করুন, সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—মেয়েটি প্রস্থান করবার জন্য পা বাড়ালো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, জন্তু-জানোয়ারের ভয় নেই তো এখানে?

—তা থাকতে পারে বইকি! এমন সুন্দর জায়গা—

—তবে? আমি যে একেবারেই নিরস্ত্র!

—তা হোক, ভয় পাবেন না! বিপদ বুঝলেই আমার নাম ধরে ডাকবেন, আমি তখুনি উপস্থিত হবো।

অঞ্জনার কথায় আমার সন্দেহ হয়। বললাম, আপনি কোথায় থাকবেন, আর আমি কোথায়—!

অঞ্জনা বললো, আমি যেখানেই থাকি না কেন, আপনি ডাকলেই

সঙ্গে সঙ্গে এখানে উপস্থিত হবো। 'অঞ্জনা' নাম ধরে ডাকবেন। আচ্ছা আপনার জন্যে খাবার আর কাপড় নিয়ে আসি।

বললাম, টর্চটা নিয়ে যান, বড্ড অন্ধকার ওদিকে।

—না, আলোর দরকার নেই। আমার চোখ অন্ধকারেও জ্বলে!

আর না দাঁড়িয়ে অঞ্জনা চলে গেল।

॥ বারো ॥

আমার হাতের ঘড়িতে রাত আটটা বেজে গেছে। সেই সকাল থেকে এই গোপন গুহার মধ্যে বসে আছি কখনো বসে আছি, কখনো শুয়ে আছি।

অঞ্জনা সন্ধ্যার একটু আগে আমাকে খাবার দিতে এসেছিল ...এসে জানিয়ে গেছে, রাত সাড়ে বারোটার সময় সে আমাকে ডাকতে আসবে। কাপালিক পূজায় বসবে বারোটায়। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ যে, এখনও পর্যন্ত কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি আমাকে। পেটেও ক্ষুধার জ্বালা নেই—সকাল থেকে এখন পর্যন্ত তিনবার খাওয়া হয়ে গেছে। অন্ধকারের নিষ্পেষণ থেকেও অঞ্জনা আমাকে বাঁচিয়েছে—বেশ বড় একটা মশাল দিয়ে গেছে। মশালটা সম্মুখে একটা গর্তে গুঁজে রেখে চুপচাপ বসে আছি। তবে একথা ঠিক যে, প্রতিক্ষণে বিপদের আশঙ্কা আর অসহ্য নীরবতায় মনে স্বস্তি নেই বিন্দুমাত্র।

সকালের দিকে অঞ্জনা আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে প্রায় সঙ্গে

সঙ্গেই একখানা শুকনো কাপড় আর প্রচুর খাবার নিয়ে এসেছিল। কয়েকখানা রুটি, কিছুটা ক্ষীর, পেয়ারাজাতীয় অত্যন্ত সুস্বাদু কতকগুলো ফল আর মাটির ভাঁড়ে করে আধসেরের বেশী গরম দুধ। অঞ্জনার কাছ থেকে জেনেছি, কাপালিকের অনুচরেরা কয়েকটা গরু পালন করে। তারা দু বেলা দুধ পৌঁছে দিয়ে যায়।

তারপর দুপুরের দিকে সাত-আটখানা রুটি, সুন্দরভাবে রাঁধা মাংস, দই, আখের গুড় আর দু-তিন রকমের ফল।

এরপর সন্ধ্যার কিছু আগে অঞ্জনা আবার এসেছিল খাবার নিয়ে। খাবার দিয়ে গেছে আর রেখে গেছে ওই মশালটা। এবার অঞ্জনার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়েছে। আগের দুবার বেশী কথা বলবার অবসর পায়নি। কাপালিককে লুকিয়ে এখানে তাকে আসতে হয়—কাজেই বেশী সময় আমার কাছে থাকবার সে সাহস পায় না। কাপালিক যদি কোন রকমে জানতে পারে, তাহলে আর রক্ষা নেই।

অঞ্জনার মুখে শুনলাম, কাপালিকের অনুচরেরা বিকালের দিকে নতুন বলি পৌঁছে দিয়ে গেছে। সেই সময় অনুচরগণসহ কাপালিক আমার খোঁজ করতে গিয়ে আমাকে দেখতে না পেয়ে অনেক খোঁজা-খুঁজি করেছিল। শেষ পর্যন্ত সে হয়তো এই গোপন গহ্বরের মধ্যেও প্রবেশ করতো। কিন্তু অঞ্জনা তাকে বার বার বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে, জলে ডুবেই আমার মৃত্যু হয়েছে। আর যদি মৃত্যু না হয়ে থাকে, তা হলে যে কোন একসময় ওদের নজরে তো আমাকে পড়তেই হবে! নতুন বলি পাওয়া গেছে···আজকের পূজোয় তো আর কোন অসুবিধা হবে না। এখুনি অত হইচই করে আমাকে খুঁজে বার করবার এমন কি দরকার? পরবর্তী অমাবস্যায় আমাকে বলি

হিসাবে গ্রহণ করা চলবে...আমি তো হাতের মুঠোর মধ্যেই রইলাম।

অঞ্জনার কথায় যুক্তি আছে দেখে কাপালিক শেষ পর্যন্ত নিরস্ত হয়েছিল।

নতুন বলি হিসাবে ওরা ছোট একটি পাহাড়ী ছেলেকে ধরে এনেছে শুনলাম। মাত্র সাত-আট বছরের ছেলেটি। সম্ভবতঃ কোন পাহাড়ী পল্লী থেকে ছেলেটিকে চুরি করে এনেছে।

কাপালিককে নিহত করার ফন্দি-ফিকিরও অঞ্জনা আমাকে জানিয়ে দিয়েছে, আর একটা ধারালো ছোরা দিয়ে গেছে আমাকে।

প্রতি অমাবস্যায় পূজার সময় দুজন অনুচর নাকি উপস্থিত থাকে। অবশ্য মেয়েটি আমাকে আশ্বাস দিয়েছে যে তাদের জন্য কোন চিন্তার কারণ নেই—ও দুজনকে অনায়াসেই শেষ করা যাবে।

অঞ্জনার সঙ্গে যখন আমার এইসব কথাবার্তা হচ্ছিল, সেই সময় তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার দেহে তো অসম্ভব শক্তি, আপনি যদি চেষ্টা করতেন, তাহলে এতদিনে নিশ্চয় কাপালিককে খুন করতে পারতেন!

অঞ্জনা বলেছিল, না, তা পারতাম না ; সে ক্ষমতা আমার নেই! আমি আর সকলের ওপর নিজের শক্তি প্রয়োগ করতে পারি বটে, কিন্তু কাপালিকের কাছে আমার কোন শক্তি খাটে না—তার কাছে আমি অসহায় শিশু মাত্র! একবার আমি তাকে আঘাত করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আমার হাতটা অবশ হয়ে গিয়েছিল। এই চারশো বছর ধরে যত কাপালিক এখানে পর পর

উত্তরাধিকার সূত্রে শব-আরাধনা আব কালীপূজা করে গেছে, প্রত্যেককেই আমি একবার করে নিহত করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই আমার শক্তি ব্যর্থ হয়ে গেছে!

আমি তখুনি প্রায় চিৎকার করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কি বলছেন আপনি স্পষ্ট করে বলুন? আপনার হেঁয়ালিতে আমি ক্রমশঃই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছি!

অঞ্জনা সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে বললো, চুপ!

তারপর মনোযোগ দিয়ে কী যেন শুনবার চেষ্টা করে বললো, কাপালিক আমাকে ডাকছে...আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না। ছোরাটা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকবেন, সাড়ে বারোটা নাগাদ ডাকতে আসবো। এর মধ্যে বোধ হয় আর আসা হয়ে উঠবে না। সুযোগ পাই তো আসবো কিছু খাবার নিয়ে।

আমি আপত্তি জানিয়ে বলেছিলাম, না, খাবারের দরকার নেই আর। প্রচুর খাওয়া হয়েছে। আপনার অনুগ্রহে যদি এখান থেকে মুক্তিলাভ করতে পারি, তখন আবার খুব করে খাওয়া যাবে, কেমন? সত্যি কথাই বলি, প্রাণে এখন সর্বদা আতঙ্ক ..খেতে একেবারেই ভাল লাগে না। পেটে যে দারুণ খিদে ছিল, সেই খিদেটা মিটে গেছে, এখন আবার পুরো একটা দিন স্বচ্ছন্দে উপোস দিতে পারি!

অঞ্জনা শুধু একটু হেসে চলে গিয়েছিল।

তারপর থেকে এই চুপচাপ বসে আছি মশালের সামনে। সারাটা দিন দিনের আলোর মধ্যে ছিলাম—মনে বিশেষ অস্বস্তি ছিল না। জন্তু-জানোয়ারের ভয়টাও বেশ লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

তারপর রাতের আঁধার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই সব অদ্ভুত জীব-জন্তুর চিন্তায় মনটা আবার বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। মেয়েটি অবশ্য প্রতিবারেই আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেনি যে, বিপদ বুঝলেই আমি যেন তার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকি।

বসে বসে ভাবছিলাম কাপালিকের কথা। এমন দুর্দান্ত লোকটাকে নিহত করতে পারবো তো? যদি না পারি? খুন করতে গিয়ে যদি ব্যর্থ হয়ে যাই? তাহলে তখনি আমাকে মৃত্যু-বরণ করতে হবে, এ সুনিশ্চিত!

কাপালিকের কথা চিন্তা করছি তন্ময় হয়ে। কিন্তু তন্ময়তার মধ্যেও আশ্চর্যভাবে আমার প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে আছে। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দেও চমকে উঠছি!—এই বুঝি কোন ভয়ংকর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটলো!

মনের যখন এই রকম অবস্থা, তখন সত্যিই একসময় এক অদ্ভুত শব্দে আমি চমকে উঠলাম। মনে হল যেন বহু নারী একসঙ্গে নূপুর পায়ে নেচে বেড়াচ্ছে! শব্দ মৃদু, তবু মনে হল নিকটেই যেন কারা নাচছে! আমি খুব বেশীরকমই চমকে উঠেছিলাম। এদিকে-ওদিকে চতুর্দিকে ইতস্ততঃ তাকাতে লাগলাম—কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না। এমন কি শব্দটা ঠিক কোন জায়গা থেকে আসছে, তাও বুঝে উঠতে পারলাম না।

বেশ তালে তালে নাচার শব্দ আসছে।

একি অদ্ভুত ব্যাপার? মেয়েটির মুখে শুনেছি; এই গুহায় কাপালিক আর সে ছাড়া তৃতীয় কোন মানুষ বাস করে না।

তবে এতগুলো মানুষের নাচের শব্দ শুনতে পাচ্ছি কেন? কোথা থেকে আসছে এ শব্দ?

মশালটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। একটু এদিক্-ওদিক্ ঘুরে দেখার ইচ্ছা—এ নৃত্য-রহস্যের কোন হদিস মেলে কিনা?

কিন্তু কোন হদিসই পেলাম না। ভেতরের দিকে গহ্বরেব শেষপ্রান্ত পর্যন্ত গিয়েছিলাম, আর এদিকেও গিয়েছিলাম প্রবেশ-দ্বার পর্যন্ত। যেখানেই যাই, সেখানেই মনে হয়, আমার একটু তফাতেই কারা যেন নাচছে। আমার সঙ্গে সঙ্গে নাচের শব্দটাও ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন। প্রায় দশ-পনেরো জন একসঙ্গে নাচলে যে রকম শব্দ হয়, ঠিক সেই রকম শব্দ। এত মেয়ে কোথা থেকে এলো, আর কোথায়ই বা তারা নাচছে? আমি ক্রমশঃই বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে লাগলাম।

শেষ পর্যন্ত অগত্যা অনুমান করে নিতে বাধ্য হলাম যে, এমন কোন অদৃশ্য জায়গা থেকে এই নাচের শব্দ আসছে, যে জায়গার খবর একমাত্র অঞ্জনার কাছ.থেকেই পেতে পারি।

কিন্তু তাই বা কেমন করে হয়? কোন নির্দিষ্ট জায়গা থেকে শব্দ এলে সে-শব্দ আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে কেন? এ কী রহস্য? গল্পের বইএ ভূত-প্রেতের নানা অদ্ভুত অদ্ভুত অবিশ্বাস্য গল্প পড়েছি। এও কি তবে কোন ভৌতিক ব্যাপার? উঁহু, এসব কী ভাবছি? ভূত-প্রেত আমি বিশ্বাস করি না! ভূত বলে কিছু নেই পৃথিবীতে। যারা ভূত-প্রেতের কথা বলে তারা সুস্থ মস্তিষ্ক নয়। কিন্তু......তবে......সেই রহস্যময়ী ছাড়া এ রহস্যের মীমাংসা হবে না!

"অঞ্জনা দেবী" বলে ডাকতে উদ্যত হয়েও থেমে গেলাম। চুপচাপ তো বসেই রয়েছি—তার চেয়ে বরং আর একবার ভাল করে খুঁজেই দেখি না। নিকটেই কারা নাচছে এতে কোন ভুল নেই। আর একবার মনোযোগ দিয়ে অনুসন্ধান করলে হয়তো ব্যাপারটার হদিস মিললেও মিলতে পারে।

তাছাড়া চিৎকার করে অঞ্জনাকে ডাকাডাকি করাও খুব নিরাপদ হবে বলে বোধ হচ্ছে না। অনর্থক একটা বিপদের সৃষ্টি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়! তার চেয়ে নিজের চেষ্টায় যতটা পারি অনুসন্ধান করে দেখি। আর কিছু না হোক, সময় তো কাটবে। চুপচাপ বসে থেকে সময় যেন আর কাটতেই চায় না। তার ওপর নানা দুশ্চিন্তা। বরং এ বেশ ভালই হল ..কৌতূহলের মধ্যে দিয়ে সময়টা তাড়াতাড়ি কেটে যাবে।

ঝিম-ঝিম ঝুমা-ঝুম ঝুম-ঝুম...

একতালে বহু নূপুরের মিষ্টি আওয়াজ আমার চতুর্দিক্‌টাই যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

উঠে দাঁড়ালাম। এগিয়ে গেলাম মশালের কাছে। মশালটা হাতে নিয়েছি, এমন সময় মনে হলো, আমার চারিপাশে যেন অনেক লোক-জন ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। নাচের শব্দ আর শুনতে পেলাম না। আমার তো হৃদ্‌কম্প শুরু হয়ে গেল। একি কাণ্ড! জনমানবহীন গুহার মধ্যে এসব কি? এত কাছে এত লোকজনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, অথচ একটি লোককেও দেখতে পাচ্ছি না! ঘটনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও এরকম অসম্ভব ঘটনা ঘটতে পারে বলে তখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না!

ভাবতে লাগলাম, আমার শোনার ভুল হচ্ছে না তো? নাচের শব্দ, ছুটোছুটির আওয়াজ সবই হয়তো আমার শোনার ভুল! আসলে হয়তো কোন শব্দই হচ্ছে না...বীভৎস আবহাওয়ার মধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করার ফলে হয়তো আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে। এবং সম্ভবতঃ সেই বিকৃত মস্তিষ্কেরই প্রতিক্রিয়া এটা!

একথা ভাবতে আমার মাথা আরও গরম হয়ে উঠলো! সর্ব-শরীর ঘামতে শুরু হলো। মশালটা হাতে নিয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

চতুর্দিকে অদৃশ্য লোকেরা উন্মাদের মত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। আমার মনে হতে লাগলো, আমি যেন ওদের পায়ের চাপে এখুনি পিষে যাব!

সহসা কে যেন আমার ঠিক পাশটাতেই "আঃ—" শব্দে আর্তনাদ করে উঠলো।

আমি ভীষণ চমকে উঠে দু পা পিছিয়ে গেলাম। কই, কেউ তো কোথাও নেই। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আর দাঁড়াতে পারলাম না। "অঞ্জনা দেবী—অঞ্জনা দেবী" বলে দুবার চিৎকার করে মশালটা হাতে নিয়েই ছুট দিলাম গহ্বরের মুখের দিকে।

খানিকটা গিয়ে মুহূর্তের জন্যে একবার থামলাম। মনে হল, বহু লোক যেন আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসছে...স্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আবার ছুট দিলাম।

এই যে এসে গেছি গহ্বরের মুখের কাছে। এদিকেও একটা উঁচু পাথর রয়েছে, সেই পাথরে পা দিয়ে গহ্বরের মুখে উঠে ওদিকে লাফিয়ে পড়লাম।

—অঞ্জনা দেবী! অঞ্জনা দেবী!

—চিৎকার করে ডাকলাম আবার। তারপর ছুটতে গিয়েই কিসে যেন পা লেগে হোঁচট খেয়ে পড়লাম কঠিন পাথরের ওপর। মশালটা কতদূরে ছিটকে গেল কে জানে! বুকে তীব্র আঘাত অনুভব করলাম। তারপর?

তারপরের কথা আব মনে পড়ে না।

॥ তেরো ॥

জ্ঞান ফিরে আসতেই মাথাব চুলে কার হাতের মৃদু স্পর্শ পেলাম। কে যেন সস্নেহে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালাম। দেখতে পেলাম আমার পাশে একটা মশাল দাউদাউ কবে জ্বলছে, আর অঞ্জনা শিয়বে বসে মাথায় হাত বুলোচ্ছে। আমাকে তাকাতে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো, খুব কষ্ট হচ্ছে আপনাব?

ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, নাঃ; তবে শরীরটা বড় দুর্বল বোধ হচ্ছে। হঠাৎ কেন যে এমন হল···

পরক্ষণেই একে একে সব কথা আমার মনে পড়ে গেল। বুঝতে পারলাম, বুকে আঘাত লাগায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

অঞ্জনা জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার বলুন তো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে!

যা ঘটেছিল, সব বললাম। তারপর জানতে চাইলাম, এর কারণ কি?

অঞ্জনা বললো, একটু অপেক্ষা করুন, আগে এক গ্লাস সরবত নিয়ে আসি .গাছ-গাছড়ার রসের সরবত...খেয়ে দেখবেন শরীর আগেকার মতই আবার সবল হয়ে উঠবে।

অঞ্জনা উঠতে উদ্যত হয়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আমার ডাক আপনি শুনতে পেয়েছিলেন?

অঞ্জনা হেসে বললো, শুনতে না পেলে এলাম কেন? আপনি চার-পাঁচবার ডাক দিয়েছিলেন আমাকে—তাই নয় কি?

—হ্যাঁ, বোধহয় চারবার ডেকেছিলাম। আপনি সে সময় কোথায় ছিলেন?

—কাপালিকের কাছে ছিলাম।

—কাপালিক শুনতে পায়নি আমার চিৎকার?

—পাগল হয়েছেন! এখানে কামান দাগলেও সেখানে আওয়াজ যাবে না!

—কিন্তু. . .

অঞ্জনা এবার ধমক দিয়ে বললো, আঃ। আবার অবাক্ হচ্ছেন আপনি! আপনাকে তো বলেছি, এই বিশাল গুহা-রাজ্যের বাইরে দিয়ে কোন মানুষ হেঁটে গেলেও সে শব্দ আমি শুনতে পাই! আচ্ছা, সরবতটা নিয়ে আসি।

অঞ্জনা চলে গেল।

রিস্টওয়াচের দিকে চেয়ে দেখলাম, রাত বারোটা!

অঞ্জনার দেওয়া সরবত খেয়ে শরীর রীতিমত চাঙ্গা হয়ে উঠেছে আমার। সমস্ত ব্যথা-বেদনা-ক্লান্তি-অবসাদ দূর হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর—দেহ-মনে বেশ বল পাচ্ছি। কিছুক্ষণ আগে বুকে তীব্র বেদনা ছিল এবং আমি যে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, সেকথা এখন আর ভাবতেই পারছি না। বৈজ্ঞানিক-জগতের ডাক্তার-বদ্যির কাছ থেকে দু-চারদিন ধরে শিশি শিশি ওষুধ খেয়ে টাকা-পয়সার শ্রাদ্ধ করেও যে ফল পাওয়া যায় না, মাত্র দু-এক ঘণ্টার মধ্যে তার চেয়ে কত বেশী উপকার পেলাম শুধু এক গ্লাস মুখরোচক সরবত খেয়ে। ভাবতে অবাক্ লাগে বইকি! হিমালয়ের বুকে কত যে অমূল্য সম্পদ্ অনাবিষ্কৃতভাবে পড়ে রয়েছে, তার কতটুকু হিসাব আমরা রাখি।

সরবতটা খাওয়ার পর থেকেই খুব দ্রুত আমার দৈহিক এবং মানসিক উন্নতি হতে শুরু করেছিল। মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সমস্ত ক্লান্তি, দুর্বলতা, বেদনা দূর হয়ে গিয়েছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে আমার মন এমনই সতেজ হয়ে উঠলো যে, মনে হতে লাগলো, এক্ষুনি ছুটে গিয়ে কাপালিকের বুকে ছুরিটা বসিয়ে দিই।

অদৃশ্য নর্তকীদের নাচের শব্দ এবং অদৃশ্য লোকজনের ছুটোছুটি ও চিৎকার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম অঞ্জনাকে। আমার প্রশ্ন শুনে প্রথমটা ও হেসে উঠেছিল, তারপর বলেছিল, বড় বোকা আপনি! সব দেখে-শুনেও কিছু বুঝছেন না। যাদের নাচের শব্দ আর ছুটোছুটির শব্দ শুনেছেন, তাদের চারশো বছর আগে অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে এই গুহার মধ্যে! যাই হোক, আপনাকে অভয় দিচ্ছি, যদি আবারো ওই ধরনের ঘটনা কিছু ঘটে, আপনি বিন্দুমাত্র ভীত

হবেন না। বিশ্বাস করুন, আমি আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—সব সময়েই আপনার মঙ্গল কামনা করছি।

বলেছিলাম, একথা আমি বিশ্বাস করি অঞ্জনা দেবী।

—অসংখ্য ধন্যবাদ!—বলেছিল অঞ্জনা।

আশ্চর্য মেয়েটি!

চুপচাপ বসে বসে এই কথা ভাবছি।

গোপন গহ্বরের মধ্যে আর প্রবেশ না করে বাইরেই বসে আছি। একপাশে মশালটা দাউদাউ করে জ্বলছে। মনের মধ্যে জন্তু-জানোয়ারের ভয়ও আর নেই। তার প্রথম কারণ, অঞ্জনাকে ডাক দিলেই সে এসে আমাকে রক্ষা করবে, এ ধারণা আমার মনে দৃঢ় হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় কারণ অত্যন্ত সতেজ মন। অঞ্জনার মুখে মায়াবী কাপালিকের কাহিনী শুনে এবং অদ্ভুত অদ্ভুত পরিবেশের সম্মুখীন হয়ে আমার মন একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু মনের সে ভাব আর নেই। এখন মনের মধ্যে বেশ একটা বেপরোয়া উত্তেজনা অনুভব করছি।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে। সাড়ে বারোটায় অঞ্জনা আসবে। মাত্র আর কুড়ি মিনিট দেরি। তারপর শুরু হবে আর এক রোমাঞ্চ-কর অধ্যায়·······

অঞ্জনার কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম, হুঁশ হল তার ডাকে—আসুন!

ডাক শুনেই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালাম। নিতান্তই অকারণে প্রশ্ন করলাম, মশালটা এখানেই থাকবে?

—থাক। আসুন আমার পিছনে পিছনে। আপনার কাছে

যে আলোটা আছে জ্বালবেন না—বিপদ হতে পারে! জ্বালবার দরকার হলে আমি বলবো।

সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে আমি অঞ্জনার পিছু নিলাম। যেদিকে সেই মাকড়সার মত অদ্ভুত জীবটা মবে পড়ে আছে, সেইদিকে চলতে লাগলাম। অঞ্জনা বলেছিল বটে ওদিকে একটা পথ আছে—সেই পথে কাপালিক নদীতে জল নিতে আসে।

কিছুটা অগ্রসর হয়ে অঞ্জনা বললো, এবার আলোটা একবার জ্বালুন···সামনে সেই জন্তুটা পড়ে আছে···

টর্চের বোতাম টিপলাম। দেখলাম, সমস্ত বাহুগুলো কুঁকড়ে কাঠ হয়ে পড়ে আছে সেটা! রক্ত যা বেরিয়েছিল জমে কালো হয়ে গেছে। দেখেই গা একটু কেঁপে উঠলো···আস্তে আস্তে পা ফেলে জীবটাকে পাশ কাটিয়ে গেলাম। তারপর সম্মুখ দিকে চাইতেই দেখলাম, পথ রুদ্ধ করে যে পাষাণ-প্রাচীর দাঁড়িয়ে ছিল, সেই প্রাচীরের গায়ে দরজার মত একটা পথ উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে!

অঞ্জনা ওই দরজার মধ্যে দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। আমি অনুসরণ করলাম তাকে। সুড়ঙ্গের মত পথ চলে গেছে সোজা। সুন্দরভাবে খোদাই করা সমতল পথ। টর্চ নিবিয়ে নিবিড় অন্ধকারেব মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। টর্চ জ্বালা নিষেধ।

চলতে চলতে অঞ্জনা একসময় বললো, এবার ডানদিকে আসুন।

অন্ধকারে কিছুই নজরে পড়ে না। অনুমানে বুঝলাম, নতুন রাস্তায় পা দিয়েছি। এত অন্ধকারে তাড়াতাড়ি যাওয়া চলে না—পা ঘষে ঘষে চলতে লাগলাম। অঞ্জনা বোধহয় তাড়াতাড়ি চলতে পারতো, কিন্তু আমার জন্য তাকেও ধীরে ধীরে চলতে হচ্ছে।

কিছুটা এগিয়ে সে থমকে দাঁড়ালো। আমিও দাঁড়ালাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার ?

অঞ্জনা বললো, আপনার একটা শিকার আসছে বোধ হয় ! পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট !...হুঁ আমাদের দিকেই আসছে ! খুব সাবধান !

ওর কথা শেষ হতে হতেই লালচে আলোর আভা চোখে পড়লো। ব্যস্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, এবার কি কর্তব্য আমাদের ?

—কর্তব্য তো স্থির করাই আছে। কাপালিকের একজন অনুচর আসছে—ওকে যমালয়ে পাঠাতে হবে আর কি ! খানিকটা সুবিধা হয়ে গেল শিকার নিজেই আসছে আপনার কাছে—আমাকে আর পরিশ্রম করতে হলো না। একটু পিছিয়ে আসুন, আপনার জন্যে একটা জায়গা ঠিক করে দিই...সেখানে অপেক্ষা করবেন। তারপর আমাব কি কাজ এবং আপনার কি কাজ, সে তো···

—হুঁ মনে আছে !···আমি বললাম।

পিছিয়ে আবার সেই সুড়ঙ্গের কাছেই এলাম। এবং অঞ্জনার কথামত সুড়ঙ্গ-পথের হাত তিনেক অভ্যন্তরে গিয়ে দাঁড়ালাম। মশালের আলো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কোমব থেকে ছোরা'টা বের করে ডান হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরলাম।

—প্রস্তুত হয়ে নিন !—একথা বলেই অঞ্জনা আমার কাছ থেকে চলে গেল।

॥ চৌদ্দ ॥

উত্তেজিত বক্ষে অপেক্ষা করতে লাগলাম সঙ্গান মুহূর্তটিব জন্য। জীবনে নরহত্যার কল্পনা কোনদিন কবিনি—আজ আমাকে সেই কল্পনাতীত কাজটিই কবতে হবে।

একটু পরেই কথাবার্তার আওয়াজ কানে এলো। পুরুষ ও নারীকণ্ঠের কথোপকথন। বুঝলাম অনুচরটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে অঞ্জনা এগিয়ে আসছে। মশালেব আলোয় অন্ধকারের অস্পষ্টতা দূব হয়েছে দেওয়ালের গায়ে গা মিশিয়ে আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বইলাম।

ক্রমশঃই নিকটবর্তী হতে লাগলো কথাবার্তার আওয়াজ। একেবারে কাছে এসে গেছে ওবা দুজনে। আমার দেহ আগুন হয়ে উঠেছে··· মাথার ভেতরকাব শিরা-উপশিরাগুলো দপদপ করে লাফাচ্ছে! এবার আমাকে নরহত্যা করতে হবে! পৃথিবীর জঘন্যতম নিষ্ঠুর পাপকার্য!

কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় কি! নিজেকে বাঁচাতে হলে···

নাঃ, এ কাজে পাপ নেই! নরহত্যা পাপ কার্য বটে, কিন্তু নরপিশাচ হত্যায় পুণ্য আছে! এই তিন পিশাচকে হত্যা করতে পারলে আমি বাঁচবো, অঞ্জনা বাঁচবে, আর বাঁচবে ভবিষ্যতের অগণিত বলি! এ নরহত্যায় পাপ নেই!

মশালের আলোয় সহসা আমার দুচোখ ধাঁধিয়ে গেল। পাশা-পাশি দুজন হেঁটে যাচ্ছে সামনে দিয়ে। অঞ্জনা রয়েছে আমার

দিকে—যাতে আমি দুশমনটার নজরে না পড়ি! এ লোকটার চেহারাও কাপালিকের মতই ভয়ংকর। তার হাতে জ্বলছে বিরাট এক মশাল। অঞ্জনা আমার দিকে একবার তাকিয়েই সহসা দুশমনটার মুখ দুহাতে চেপে ধরলো। আমি প্রস্তুত হয়ে ছিলাম এই মুহূর্তটির জন্যই। ছুটে গিয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ছোরাটা বসিয়ে দিলাম লোকটার বুকে। ছোরাটা অত্যন্ত ধারালো ছিল। সমস্ত ফলাটা বসে গেল তার বুকের মধ্যে!

অঞ্জনা এমনভাবে তার মুখ চেপে ধরেছিল, টুঁ-শব্দটি বেরুলো না তার মুখ দিয়ে। ওর চিৎকার যাতে কাপালিকের কানে না পৌঁছাতে পারে, সেইজন্যই এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। কিছু সময় নিঃশব্দে ছটফট করে লোকটা নিস্তেজ হয়ে পড়লো। অঞ্জনা তার দেহটা টেনে নিয়ে গিয়ে সুড়ঙ্গ-পথের অনেকটা অভ্যন্তরে রেখে এলো। বলা বাহুল্য, ছোরাটা আমি খুলে নিয়েছি লোকটার বুক থেকে।

এরপর একই পদ্ধতিতে অপর চেলাটাকেও হত্যা করা হল। এবার অবশ্য শিকার স্বেচ্ছায় আসেনি। লোকটা ছিল কাপালিকের কাছে। অঞ্জনা তাকে বাজে কথায় ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল। ভেবেছিলাম নরহত্যা করতে পারবো না। কিন্তু কত সহজে লোক দুটোর বুকে ছোরা বসিয়ে দিলাম, ভাবতে অবাক্ লাগে!

এবার মন্দিরের দিকে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। চেলা দুটোর মতো কাপালিককেও সহজে হত্যা করতে পারবো ভেবে মনে বেশ উৎসাহ পাচ্ছি। বেশ একটা বেপরোয়া ভাব এসেছে মনে—এ এমন আর কী শক্ত কাজ?

চলতে চলতে অঞ্জনা চুপিসাড়ে বললো, কাপালিক খুব মনোযোগ দিয়ে পূজা করছে—তার দ্রুত মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

কিছুসময় অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলার পর আমরা আলোকিত জায়গায় এসে পড়লাম। দেখতে পেলাম সম্মুখ দিকে আমাদের পথের তুপাশে সারি সারি কতকগুলো মশাল জ্বলছে। আলোর মধ্যে এসেই সংকুচিত হয়ে পড়লাম। অঞ্জনা আমার মনের ভাব বুঝে বললো, ভয় নেই আসুন—

এবাব আমার কানেও মন্ত্রোচ্চারণেব ধ্বনি এসে পৌঁছচ্ছে! অঞ্জনা অভয় দিলেও আমাব মন কিন্তু সংকুচিত হয়েই রইলো। মনে হতে লাগলো, এই বুঝি কেউ দেখে ফেলবে আমাকে! একমাত্র কাপালিক ছাড়া এই গুহারাজ্যে দ্বিতীয় কোন শত্রু নেই, একথা ঠিক সেই মুহূর্তে আমি যেন বিশ্বাস করতেই পারছিলাম না।

বিচিত্র মানুষের মন!

এপাশে ওপাশে সম্মুখে পশ্চাতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতে করতে আমি অগ্রসর হতে লাগলাম। অঞ্জনা আমার আগে আগে চলেছে।

ক্রমে আমরা এসে পৌঁছলাম আমাদের গন্তব্যস্থলে। অঞ্জনা ইশারায় আমাকে দাঁড়াতে বলে নিজেও দাঁড়ালো। এদিকের পথ সুপ্রশস্ত। মশাল জ্বলছে অনেকগুলো। বেশ আলোকিত হয়ে আছে জায়গাটা। অবাক্ হয়ে তাকাতে লাগলাম চারিদিকে! অবাক হবার মতই বটে! আমি সত্যই যেন এক রাজপ্রাসাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি! মৌন জনহীন রাজপ্রাসাদ! উভয় পাশে বড় বড় ঘর···মাঝে মাঝে বিরাট কারুকার্য করা থাম···মাথার

ওপর সুন্দর ছাদ। এতক্ষণ শুধু নানা পথ দেখেই বিস্মিত হয়েছি—কিন্তু এবারকার বিস্ময় একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গেল। পাথর কেটে এমন প্রাসাদ তৈরি করা সম্ভব, তা আমি ধারণাতেই আনতে পারছি না! আশ্চর্য—অদ্ভুত!

—ঐ যে মন্দির।

একটু তফাতের একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে খুব চাপাস্বরে অঞ্জনা কথাটা আমাকে বললো। চেয়ে দেখলাম, ওই একটিমাত্র ঘরেই আলো জ্বলছে। ও ঘরটা আমাদের পথের ডান পাশে। অঞ্জনা জিজ্ঞেস করলো, মনে আছে তো সব কথা?

—আছে।

সংক্ষেপে জবাব দিলাম। আমার বুক দুরুদুরু করে কাঁপতে শুরু হয়েছে······বেশ ভয় ভয় করছে আবার। মনের মধ্যে আবার সন্দেহের দোলা জাগছে, শয়তানটাকে বিনাশ করতে পারবো তো? প্রতিমুহূর্তেই আমাব মনের চিন্তাধারার পরিবর্তন হচ্ছে।

অঞ্জনা বললো, আর দেরি করে লাভ নেই, আসুন—

পায়ে পায়ে দুজনে অগ্রসর হতে লাগলাম। মন্ত্রের গুরু-গম্ভীর আওয়াজে চারিদিক্ থমথম করছে! সত্যি কথা বলতে কি, এমন ভয়ংকর পরিবেশের মধ্যে পড়ে আমার সারা দেহ ছমছম করতে লাগলো।

খুব সন্তর্পণে এসে আমি উঁকি দিলাম মন্দিরের অভ্যন্তরে। বিরাট ঘর। ঘরটার মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে প্রায় চার হাত দীর্ঘ কালীপ্রতিমা। মায়ের অতি ভয়ংকর চেহারা দেখে

আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম! মূর্তির দিকে বেশ খানিকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর আমি দৃষ্টিপাত করলাম পূজারী কাপালিকের দিকে। দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে সে। মুখে অনর্গল মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে··· ···

অঞ্জনা আমার পিঠে আঙুলের খোঁচা দিয়ে ইশারায় আমাকে জানালো, আর দাঁড়াবেন না, তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে কাজ শেষ করুন···কোন ভয় নেই···

অঞ্জনার চোখের ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আমি আবার তাকালাম কাপালিকের দিকে। কাপালিকের সম্মুখে এবং উভয় পার্শ্বে পূজার নানা উপচার সাজানো। ডানহাতের কাছে তার ত্রিশূলটা একটা কিসের ওপর খাড়াভাবে বসানো রয়েছে। মশালের আলো লেগে ত্রিশূলের ফলাটা অত্যন্ত চকচক করছে। ত্রিশূলের চকচকানি দেখে আমি বেশ আড়ষ্ট হয়ে পড়লাম। ভয় হতে লাগলো, ওকে নিহত করবার আগেই ও যদি ত্রিশূলটা বসিয়ে দেয় আমার বুকে! ইতিপূর্বে অঞ্জনার প্ররোচনায় যারা যারা কাপালিককে নিহত করতে গিয়েছিল, তারা শেষপর্যন্ত ওই ত্রিশূলের আঘাতেই নাকি মৃত্যুবরণ করেছে—একথা আমার অঞ্জনার মুখেই শোনা!

—ভয় পাবেন না, যান! দেরি করলে বিপদ হতে পারে!

ইশারাতেই একথা আমাকে জানিয়ে দিল অঞ্জনা।

মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে সাহস সঞ্চয় করলাম। মনের সমস্ত দুর্বলতা দূর করে পা টিপে টিপে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। কাপালিক যেরূপ তন্ময় হয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করছে, তাতে সহসা আমার পায়ের শব্দ তার কানে পৌঁছবে না, এটুকু ভরসা আছে।

এক পা এক পা করে খুব সন্তর্পণে অগ্রসর হতে লাগলাম। চলতে চলতে কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই অঞ্জনার সমস্ত উপদেশগুলো

একবার স্মরণ করে নিলাম। সর্বপ্রথম আমার কি কাজ, তারপর কি করতে হবে···তারপর···চকিতের মধ্যে সবটা ভেবে নিলাম। শয়তানটাকে হত্যা করতেই হবে। ওকে নিহত করতে পারা না পারার ওপরেই আমাদের জীবনমরণ নির্ভর করছে। "আমাদের" কথাটা বলা ভুল হলো। অঞ্জনার দিন যেমন কাটছিল তেমনিই কাটবে···মৃত্যু হবে আমার!

কাপালিকের সামনের জল-ভরা ছোট কলসীটা এবার দেখতে পাচ্ছি। কলসীটার মুখে সিঁদুর মাখা একটা বেলফল রয়েছে, আর রয়েছে কতকগুলো নানাজাতীয় ফুল। পূজা আরম্ভ করবার আগে কাপালিক ওই কলসীর অভ্যন্তরেই নাকি তার সমস্ত মায়াশক্তি মায়ের নামে অর্পণ করে রাখে।

কলসীটা চোখে পড়তেই আমার সর্বশরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। মনে-প্রাণে প্রবল উত্তেজনা অনুভব করলাম। কাপালিকের কাছ থেকে আমি তখন প্রায় হাত পাঁচেক তফাতে।

ছোরাটা আমার হাতেই ছিল। সেটা বেশ শক্ত করে চেপে ধরে আমি মুহূর্তেক স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। তারপর আবার এক পা এক পা করে কাপালিকের আরও নিকটবর্তী হতে লাগলাম। কাপালিক আমার লক্ষ্য নয়—লক্ষ্য হল কলসীটা! আগে কলসী, পরে কাপালিক!

কাপালিকের একেধারে সন্নিকটে পৌঁছে আমি আচমকা লাফিয়ে পড়লাম। তার সামনে এবং ক্ষিপ্রহস্তে কলসীটি দুহাতে তুলে ছুঁড়ে দিলাম খানিকটা তফাতে। দেওয়ালের গায়ে লেগে কলসীটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল!

ইত্যবসরে কাপালিকেরও ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে। প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, পরক্ষণেই সে রক্তবর্ণ চোখে ত্রিশূলটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এক পলকের জন্য একবার কলসীটার অবস্থা দেখে নিয়ে ত্রিশূল উঁচিয়ে সে এগিয়ে আসতে

লাগলো আমার দিকে। আমিও অঞ্জনার নির্দেশমত সাঁৎ করে সরে প্রতিমার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম, এবং চেয়ে দেখলাম, কয়েকটা পাথরের টুকরো পড়ে রয়েছে আমার পায়ের কাছে। আমি ক্ষিপ্রহস্তে একটা বড় টুকরো তুলে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে কাপালিককে সম্মুখে পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বীভৎস মূর্তিতে সে আবির্ভূত হল আমার সামনে। আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। সে সামনে আসতেই তার কপাল লক্ষ্য করে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে পাথরটা ছুড়ে মারলাম।

মাত্র হাত চারেকের ব্যবধান। এ লক্ষ্য ব্যর্থ হবার নয়! 'আঃ' শব্দে তীব্র আর্তনাদ করে সে দুহাতে মুখটা চেপে ধরলো। পাথরটা লেগেছে ঠিক নাকের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে আহত স্থান দিয়ে হুহু করে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ত্রিশূলটা খসে পড়েছে হাত থেকে।

সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত! আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করা উচিত নয়। আমি বাঘের মত শয়তানটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সজোরে ছোরা দিয়ে আঘাত করলাম তার বুকের ঠিক মাঝখানে। সমস্ত ফলাটা বুকের মধ্যে বসে গেল।

ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। আমি দু-পা পিছিয়ে এলাম। পাথরের তীব্র আঘাত পেয়েও সে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু এবার দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লো। কিন্তু তবু তার প্রতিহিংসা নেওয়ার উন্মাদনা কমে না। বুক থেকে ছোরাটা টেনে খুলে ফেলে সে আবার ত্রিশূল নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, এবং টলতে টলতে এগিয়ে আসতে লাগলো আমার দিকে। আমিও আর দাঁড়ালাম না—ছুটে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

আমার মনের ভয় অবশ্য দূর হয়ে গেছে। যেভাবে ছোরাটা তার বুকে বিঁধেছে, তাতে কোনক্রমেই সে বাঁচতে পারবে না,

এ বিশ্বাস আমাব আছে। ওই বকম ভীষণ আঘাতে কোন মানুষই বাঁচতে পাবে না!

ঘব থেকে বেরুতেই দবজাব পাশে অঞ্জনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি থমকে দাঁড়ালাম। অঞ্জনা বললো, আমি দেখেছি সব, ভয়েব কিছু নেই আর শযতান এবাব মববে! ওঃ! আমাব যে কী আনন্দ হচ্ছে!...দেখুন কতদূব এলো?

মন্দিবেব ভেতব তাকালাম। নাঃ, আব তেমন এগোতে পাবছে না। এক পা কবে এগোচ্ছে আব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে। এবং সেই সঙ্গে মুখ দিয়ে অনববত একটা চাপা যন্ত্রণাসূচক আওয়াজ বেরুচ্ছে! তবু আশ্চর্য! তাব আক্রোশ কমেনি এতটুকু! কঠিন দৃষ্টিতে সে আমাব দিকে চাইছে।

অঞ্জনা জিজ্ঞেস কবলো, আসছে?

বললাম, এক পা এক পা কবে আসছে বটে, তবে এতটা আসতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না—শক্তি ক্রমশঃই লোপ পাচ্ছে!

শুনে সে বললো, আসুন, একটু তফাতে গিয়ে আমরা অপেক্ষা কবি।

আমাব মনে আব ভযেব লেশমাত্র নেই। বেশ একটু খুশীব মেজাজে বললাম. উঁহু, শযতানেব মৃত্যু দেখতে চাই অঞ্জনাদেবী। পৃথিবীব এতবড একজন মাযাবী পিশাচ... ..এব মৃত্যু দেখা পুণ্যেব কথা!

—তা বটে!

মৃদু হাসলো অঞ্জনা।

কাপালিকেব দিকেই চেয়ে ছিলাম। দেখলাম আব অগ্রসব হতে পাবছে না সে। খুব বেশীবকম টলতে শুরু করেছে। কিন্তু তবু সে বরাবর আমার দিকেই চেয়ে আছে। তার ওই সেই অন্তিম দৃষ্টি কী ভীষণ, তা ভাষায় প্রকাশ কবা সম্ভব নয়। তাব সেই চাহনিতে আমার গা ছমছম কবছিল।

তারপর দেখলাম সে তার হাতের ত্রিশূলটা উঁচু করে তুলে ধরেছে। বুঝলাম, সে এবার ওটা আমার দিকে ছুঁড়বে। তার পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়······মৃত্যু এসে গেছে নিকটে—এটা বুঝেই সে শেষ চেষ্টা করতে চায়।

কিন্তু সে-চেষ্টা তার আর সফল হল না। ত্রিশূলটা ছুঁড়বার আগেই সে সশব্দে পড়ে গেল। অঞ্জনার দিকে চেয়ে দেখলাম, তার মুখে পরিপূর্ণ তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে। আনন্দের উচ্ছ্বাসে সে বলে উঠলো, ওঃ, চারশো বছর, চারশো বছর পব আজ আমি মুক্তি পেলাম!

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললো, জানেন, এই চারশো বছর ধবে আমি কত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছি······কত অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছি!

আমি বললাম, আপনার জীবনের রহস্য আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আপনার সব কথা যদি আমাকে বলেন······

ম্লান হেসে অঞ্জনা বললো, দু-চার ঘণ্টায় বা দু-চার দিনে সে গল্প বলা যায় না······সে গল্প বলতে হলে দু-চার মাস সময়ের দবকার!···যাক, এখানে থেকে আর লাভ নেই, ওকে একটু শান্তিতে মরতে দিন। দেখছেন না, কীরকম ভয়ংকর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে—আমাদের দেখে আক্রোশে ও জ্বলে পুড়ে মরছে! আমরা ওর চোখের সামনে না থাকলে হয়তো আক্রোশ ভুলে গিয়ে কিছুটা শান্তিতে মরতে পারবে!

বললাম, বেশ চলুন······কোথায় যাবেন এবার?

—এত রাতে কোথায় আর যাব? কিছু খেয়ে-দেয়ে যেটুকু রাত বাকী আছে, একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক। তাবপর ভোর হলে যদি সমস্ত প্রাসাদটা দেখতে চান, দেখে বেরিয়ে পড়া যাবে—আর কি!

এই অভিশপ্ত প্রাসাদ দেখবার বিন্দুমাত্র আগ্রহও আমার আর

নেই। এখান থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর আলো-বাতাসেব মধ্যে যেতে পারলে বাঁচি। মনে হচ্ছে এক্ষুনি ছুটে বেরিয়ে যাই। অঞ্জনাকে বললে সে-ও হয়তো রাজী হবে—কিন্তু এত বাতে বাইরে বন-ঝোপের মধ্যে গিয়ে লাভই বা কি আছে? লাভ তো কিছুই নেই, বরং নানা বিপদ আপদ ঘটতে পারে! তাই আর কোন কথা না বলে অঞ্জনার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম। বললাম, খিদে অবশ্য কিছু পায়নি—তবে একটু বিশ্রাম নিলে মন্দ হয় না।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে সে একটা ঘরের মধ্যে এসে পৌঁছাল, এবং বললো, আপনি বিশ্রাম করুন, কিছু খাবার নিয়ে আসি।

আপত্তি জানিয়ে বললাম, না, রুচি নেই একেবারে, খেতে পারবো না।

অঞ্জনা বললো, তা বুঝতে পারছি। বেশী কিছু আন'বা না—শুধু দু-একটা ফল।

বেরিয়ে গেল সে।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিলাম মেঝের ওপব। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মেঝে।

বাকী রাতটুকু খুব তাড়াতাড়িই কেটে গেল।

আমার চোখে ঘুম আসেনি কোন সময়ের জন্যেও! ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম, ছ'টা।

গুহা-প্রাসাদের অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে।

অঞ্জনা ঘুমুচ্ছিল একটু তফাতে। একবার ডাকতেই ও উঠে পড়লো ধড়মড় করে। উঠে জিজ্ঞেস করলো, কি করবেন? বেরিয়ে যাবেন?

বললাম, হ্যাঁ। প্রাসাদ দেখবার ধৈর্য আমার নেই—আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না এখানে।

—বেশ আসুন।

অঞ্জনার পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম। এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা, ও রাস্তা থেকে সে রাস্তা—

অঞ্জনা জিজ্ঞেস করলো, এখানে যে ধনরত্ন রয়েছে, তা নেবার ইচ্ছা আছে নাকি আপনার ?

আমি হেসে বললাম, নঃ, ও অভিশপ্ত ধনরত্নে আমার প্রয়োজন নেই !

অঞ্জনা বললো, আমিও তাই বলতে চাই। ও ধনরত্ন স্পর্শ না করাই ভাল।

একটু নীরবে চলার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা কাপালিকের অন্যান্য যারা অনুচর রয়েছে, তারা তো আবার—

আমাকে সম্পূর্ণ বলবাব অবকাশ না দিয়েই অঞ্জনা বললো, তারা এই গুহার মধ্যে এসে আবার প্রতিমার পূজা করতে পারে এবং যথানিয়মে নরবলিও দিতে পারে—কিন্তু মায়াশক্তি তারা পাবে না। কারণ ওই প্রধান কাপালিক এখনও তার কোন শিষ্যকে মায়াশক্তির দীক্ষা দেয়নি—দীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই তার ভবলালা সাঙ্গ হয়ে গেল ! বৃদ্ধবয়সে প্রধান কাপালিক তার প্রধান শিষ্যকে মায়াশক্তির দীক্ষা দেয়—এই ভাবেই চলে আসছিল বরাবর। নিজের চেষ্টায় ওই শক্তি অর্জন করা সাধারণ কোন কাপালিকের পক্ষে সম্ভব নয়। রাজামশায়ের আমলের সেই কাপালিকই একমাত্র তা পেরেছিল, এবং তার সেই শক্তিই একে একে উত্তরাধিকার সূত্রে সকলে পেয়ে এসেছে।

কথা বলতে বলতে আমরা গুহা-প্রাসাদের বাইরে পৃথিবীর মুক্ত আকাশের নীচে এসে পড়লাম।

অঞ্জনা জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যেতে চান এবার ?

কিছু বলবার আগেই কাছাকাছি কোথায় যেন বন্দুকের আওয়াজ হল। মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো আমার। অসীম বা উৎপল কেউ ফায়ার করলো না তো ?

অঞ্জনাকে বললাম, শব্দ শুনতে পেলেন ? কেউ শিকারে

বেরিয়েছে বোধ হয়। কিংবা আমার বন্ধুরা হলেও হতে পারে! আমি আগে দেখতে চাই ওরা কারা? সামনের দিক্ থেকে শব্দটা এলো না?

—হুঁ। চলুন।… অঞ্জনা বললো।

যা ভেবেছিলাম তাই! কয়েক পা অগ্রসর হয়ে একটা বড় ঝোপ অতিক্রম করতেই খানিকটা তফাতে অসীম, উৎপল আর কুলি তিনজনকে দেখতে পেলাম। ওদের দেখে যে কী ভীষণ আনন্দ পেলাম, তা বোঝাতে পারবো না। প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলাম, অসীম—!

অঞ্জনা ছিল আমার পাশে দাঁড়িয়ে। বললো, ওঁরাই আপনার বন্ধু?

—হ্যাঁ অঞ্জনাদেবী। ভগবানের কী অনুগ্রহ…

বাকী কথা আর মুখ দিয়ে বেরুলো না আমার। পাশে তাকিয়ে অবাক্ হয়ে গেলাম! কোথায় গেল অঞ্জনা? এই তো এখানে দাঁড়িয়ে কথাটা জিজ্ঞেস করলো আমাকে…এরই মধ্যে কোথায় গেল সে! মুহূর্তের মধ্যেই একটা মানুষ তো দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে পারে না! তবে?

চতুর্দিকে তাকিয়েও কোথাও দেখতে পেলাম না অঞ্জনাকে। বহুদূর পর্যন্ত নজর পড়ছে—নাঃ! কোথাও দেখা যাচ্ছে না তাকে! এ যেন আর এক নবতম আশ্চর্য ঘটনা!

উৎপল, অসীম আর কুলি তিনজন এসে পড়লো। সকলে মিলে বহুক্ষণ তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজি করেও সেই রহস্যময়ী রমণীর কোন সন্ধানই পেলাম না!